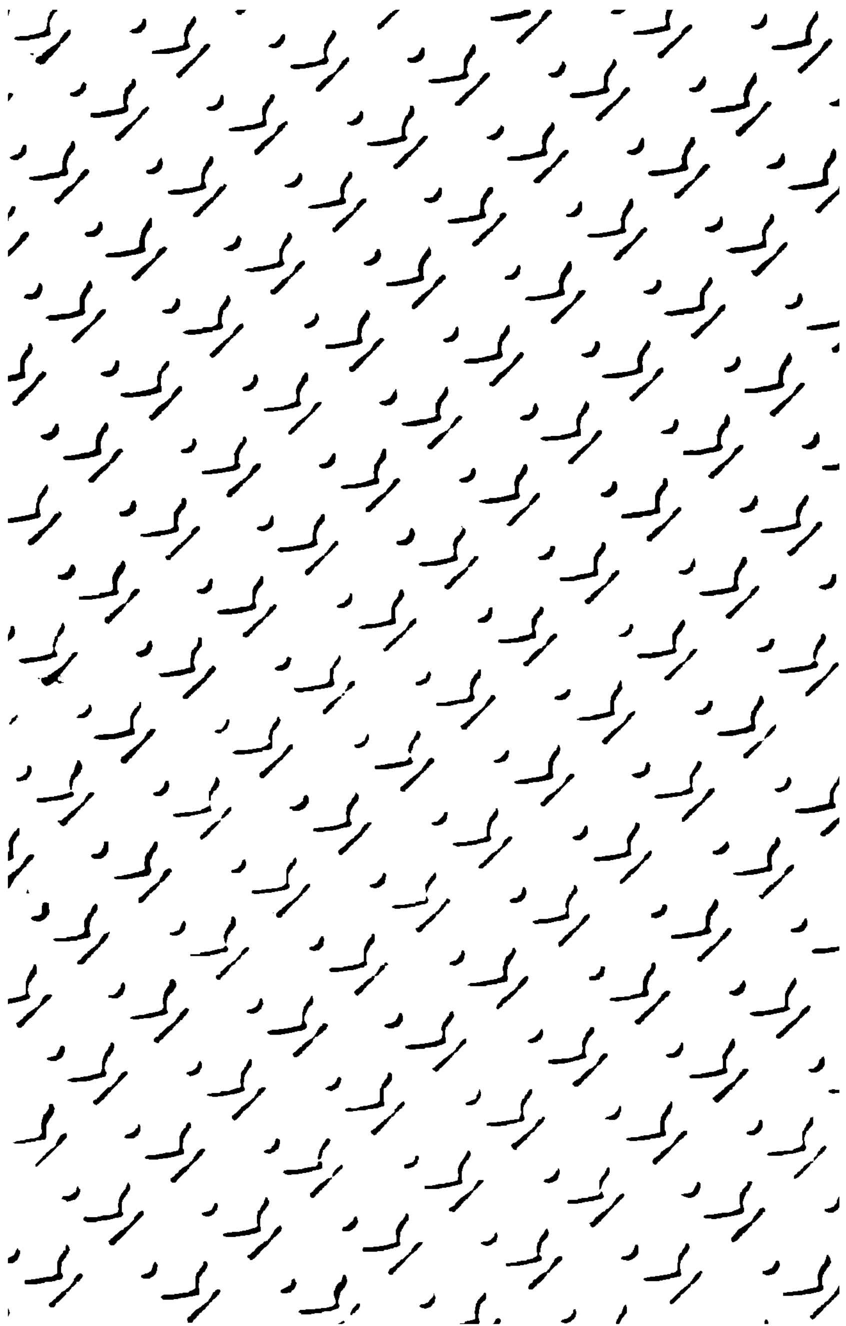
ঘরে-বাইরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





ঘরে-বাইরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৬৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪১৯ জানুয়ারি ২০১৩



প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0365-8

শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

বিমলার আত্মকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে, তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষা-সতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত, আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়—আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারো জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই, দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথায় রাজপুত্রের কথা শুনেছি—তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো—যেমন কালো তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় নাহয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়—সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়াজলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্ব-নির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর। সমস্ত জীবনকে যদি জীবন-বিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত, আমার সিঁথির সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়—সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু-পরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন, আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন—তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই—এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না। মনে করে, যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে; কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি.এ. পাস করে এম.এ. পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন; তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম, আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র

অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ—তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো-একদিন আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম—মনে জানতুম, মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে, এও তেমনি সহজ কথা—এর মধ্যে বিশেষ কোনো একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে-না-পৌঁছতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক ছাঁচে ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল—সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়। পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারী ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্যে দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী, সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন—তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল—সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনে কাজ সেরে, গা ধুয়ে,

যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম।—সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই, সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়—কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুইয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্‌ ধিক্‌। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে, প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ—আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি—আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব আসে; আমার মনে হয়, এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়ছে, সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না, দাম দিতেই হবে, নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমার দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন

আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে, তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম। তাই, মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্বণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর কিছুই না। আর, তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না—সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে-না-হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল—কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল। কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা।

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম, এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা। আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই-সমস্ত রঙ-বেরঙের জ্যাকেট শাড়ি শেমিজ পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো—লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বার বার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে, আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীনদেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারি দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে! ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যাঁর মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বার বার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তা হলে তিনি—সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব। আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে,

কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে—সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিংবা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বকশিশ দিতে হবে!—সত্য কথা বলব? অনেক বার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না, কেননা এ বাড়ির ঐরকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম, আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে-ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা—তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-একদিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না। যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে। কিন্তু ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন—সে আমার অপরাধ—কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না—মনে হত, এর মধ্যে পুরুষ-মানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো-একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা! বলি, আমাদেরও তো একদিন ছিল কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, না হয়, যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ না হয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না! আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারো উপরেও না, সে কেবল—সে আর বলব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন—তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা, ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি জ্যাকেট গয়না জুতো মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান—তুমি তো বিদ্যেসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল—মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়? যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়—ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে, ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সবরকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই। কিন্তু পথে-ঘাটে চারিদিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারি, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সইবে?

হবে হবে, আমারই মন ছোটো। আর-সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া! রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না—এই বলে আমি তাঁকে ও-মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন; বললেন, চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-এক বার মনে হয়, রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই, আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে, এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি, তখনই বার বার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে সে আমাকে মেরেছে। তাই, তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার

এ-সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি; এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল, আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সে জন্যে আমি ভাবছি নে—আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি; তাই বললুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয়? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো, খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সইতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সইতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না—তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘর-গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকর্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন।

এ কথা নানারকম আকারে বার বার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে-পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে, সাঁতলে, সিদ্ধ করে, মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়। কিন্তু যে-লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে; তার পরে যখন

ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ-আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সইতেন—তিনি নিশ্চয় জানতেন, এটাও একদিন ঘটবে—কিন্তু আমি ভাবতুম, এটা এতই কী জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব? বইয়ে পড়েছি, আমরা খাঁচার পাখি; কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিংবা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষ-মানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি—তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষ-মানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম, এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন—আমার একটু অসুখ-বিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না, কিন্তু তিনি ভাবতেন, পুরুষ-মানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, যাতে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যেই ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দর রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে, নাতবউ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদি-শাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন। আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে, এই কথাই বার বার আমার মনে হতে লাগল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে।

এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব!

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি, আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন?

আর, রাজসংসার তো এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা আশ্রিত-অভ্যাগত আত্মীয় সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই বা জানে? আমাদের মান সম্মান ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে। এ-সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে—তার দাম অনেক বেশি।

আমি মনে মনে বললুম, পুরুষ-মানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই—সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটা তেজ থাকা চাই তো। যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি-বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে, তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব, আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে,—সেদিন আমার মনে হয়েছিল, এই জায়গায় আমি যেন আমার—না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

রাত্রের সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে।

বাংলাদেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল—কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি

সেইজন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে! হুলু দিতে দিতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে!

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে-সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল, সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র—কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে একজায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল, আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন, যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস? বিষয়সম্পত্তির কথা ভাবছিস? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি

রিসীভরের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিম্বা ধান ভানার যন্ত্র কিম্বা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী-যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে উটকামন্দে যেতে হবে—নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ, আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নেই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি—আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন? যত দিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যত দিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো—।

বেশ তো, ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে।

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও—অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয়, ঘরে আগুন না লাগলে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি—ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার

প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয় আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ভাবা-চিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি, এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ—এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পর আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি—কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক্-না, ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয়-ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন—তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল—কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে। স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্য অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না-করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্‌বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল, সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বুকের ভিতরটা গুরুগুরু করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি-পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড়্‌হুড়্ করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি, রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি নে কেন আমার মনে হয়েছিল, উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া—চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম। কিন্তু আমার কেবলই মনে হত, বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ—এইরকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথা মনে উঠছে—কিন্তু, থাক্।

কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল, তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল তিনি যে অমর-লোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটা লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম, কালপুরুষের নক্ষত্রের

মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি, আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে!

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না—বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্যে—আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তাহলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ, উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপকরাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তার কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন—তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল, তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বললুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে তো সম্ভব নয়। কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তার বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম করে চাইলেন—আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই-বা কাজ নেই! আমি সন্দীপকে বলব—যদি কোনোরকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল, ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারো মন হরণ করবার জন্যে যে তা নয়। কিন্তু রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের এই জাগ্রত শক্তিকে দেখতে পাবেন? না মনে করবেন এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলো চুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মান্দ্রাজি শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে?

তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কী সাজ দেখলে?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি, ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি, সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল, সমস্ত ছেড়েছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে। মনে মনে বললুম, আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন—মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম, আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন নাহয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাত একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠবে, কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল—নিজেকে হাজারবার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন ওঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম!

কোনোরকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম। তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না; আমি খাবার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদ্‌ সুর লাগত। আমার স্বামী যে ওঁর পরমবন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান, ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন?

তিনি বললেন, আমার কুষ্টিতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজবে। বাজলও বটে। এবার আমার মৃদু কণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগল। আমি বললুম, সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বললেন, দেশের আশীর্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেইজন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলছি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমনি দ্রুত বেগে সচল যে, আর-একজনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম; আপনি যদি না আসেন তা হলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আসছি তিনি আবার বলে উঠলেন, আমার আর একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থমকে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন, আমি খাবার সময় জল খাই নে—খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি।

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণরোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কিরকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কিরকম আশ্চর্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বললেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েছেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে-হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বললেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে এক দণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না—তোমার বসবার ঘরের তিনটি শেল্‌ফ যে একেবারে—

ওগুলো কী জান? প্যুনিটিভ পুলিসের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়, আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলংকারমাত্রই যে অত্যুক্তি; সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো-একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুম, গাছপালা পশুপাখিরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানেই শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে—মেয়েদের বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি, মেজো জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে?

তিনি ফিস ফিস করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বললেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয় নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখতে পেলেন, সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বললেন, বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল, তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারি নি; মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্তিমতী নারীশক্তির মতো যেরকম নিঃসংকোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলুম, এ পর্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠতে থাকে।

এর পরেও আমি বারবার দেখেছি, আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষটুকু ছাড়তেন না।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কী তিনি জানতেন; সেইটের উল্লেখ করে বললেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না, নিখিল?

একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই—এত বড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মনভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই, লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্যি। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক—মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

এ কথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য, কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে—তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা—ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে, তাকে কি একেবারে মানবে না?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুর্ণ্য বলে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? চুরি করতে পারি নে যে তাই—সে কি বুদ্ধি আছে বলে? না, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে।

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসি জর্মান রুশ এমন কোন্ সভ্য দেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো, আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে, সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি—আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়—এ কথা বলা শক্ত, ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব, আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন?

আমি বললুম, আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার

মোহ আছে, আমি দেশকে দিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব, যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠলেন, হুর্‌রা! হুর্‌রা! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদু স্বরে বললেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ; আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়। মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে; পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে। মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে, সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর। পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি, আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়; আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে। আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী!
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা
রক্তে ফিরুক সঞ্চরি।
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ঙ্করী!

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না!

এই বলে তিনি মেজের উপর দুবার জোরে লাথি মারলেন—কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা! তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো!

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত, তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিংবা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত, কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন—কিম্বা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়-কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময় আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।

হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন-কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ-সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব, এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলি নি।

কেবল একটা কথা কোনোদিন মনে কল্পনাও করতে পারি নি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি, দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে—কী? এ কী? কী হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে, যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসেছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ী টেনে টেনে ছিঁড়ছে; আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল বলে, সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টানছে আমার হৃদয়ের সামনে ততই তার আবরু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েছে—যা দেখবার নয়, যা দেখতে চাই নে, তাও বসে বসে দেখছি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এত বড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এত কাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই নটা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোল সব চেয়ে বড়ো ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বলতে পারি, হে সত্য, তোমারই জয় হোক।

আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল, তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল, আমার মতো সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, গোপাল, মুনুকে বোলো, কাল আমি

তার ওখানে খেতে যাব। মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরিবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেছে। সেই লক্ষ্মীর হাতে অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদছে। তার ঘরের অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসি গে।—ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধুলো আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

জোর করে, অহংকার করে কী করব? নাহয় মাথা হেঁট করেই বললুম, আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সবচেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এইরকম অসংকোচে পায়ের তলায়—কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক করা কেন? ঝগড়া করে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না। অযোগ্য! অযোগ্য! অযোগ্য! নাহয় তাই হল, কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্য তাই—সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে—অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম, তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে—সে ছিল ঘর-গড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না, সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি—আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতি-সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবি নি, মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তা হলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। এ কথা কেন ভাবি নি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহংকারে? না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে, এই অহংকার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্ছে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব, এই অহংকার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবর্দস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না—ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কি, অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি, ওটা

বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কা মরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে, কোনো-একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি, তবু চাকর-বাকরকে মারধর করতে পারি নে, কারো উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু একটা বলতে বা করতে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সংকোচ বোধ হয়। আমি জানি, আমার এই সংকোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে—আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠছে যখন দেখছে আমি 'বন্দে মাতরম্‌' হেঁকে চারি দিকে যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াই নে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাই নি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিসকে ভয় করি। পুলিস ভাবছে, ভিতরে আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।

কেননা আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না—চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে, মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়—তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো-একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর ফল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাই নে, যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি। ততক্ষণ আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে, আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বললে, তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই—সেইজন্যেই স্বদেশের এই দিব্য-মূর্তিকে তুমি সত্য করে দেখতে পার না। দেখলুম, বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেননা, এ তো বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোটো ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোটো আকারেই দেখা দেয়, সেইজন্যে সেটুকুতে মিলন-গানের তাল কেটে যায় না। বড়ো সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়ো; সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই! অর্থাৎ, আমার মনের প্রদীপে তেল-বাতি থাকতে পারে, কেবল শিখার অভাব! আমি তো বলি, সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চক্‌মকি পাথরের মতো আলোকহীন; তাই এত ঠুকতে হয়, এত শব্দ করতে হয়, তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহংকার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারি। টাকার সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে, সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে তা বুঝি নি তা নয়, কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে আমি পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে এ কথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করছি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এইজন্যে ও সম্বন্ধে আমি কোনোরকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে, তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোটো হয়ে যায়। কী জানি হয়তো তার মধ্যে আমার মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে, হয়তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে-বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না। কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে, এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বললেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়; তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না, কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল চাদানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বললে, আমরা এই-যে চার দিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে।

আমার মনে হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু পরে বললে, দুরকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার দিকে ঘুরে কাজ করা কিম্বা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিম্বা স্বভাব-অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল, ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বুঝবার একটা কারণ ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো-এক জায়গায় পাই নি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখি নি। ধিক্, এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখি নে। আমি উপলক্ষমাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব, এ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি। না না, আপনি লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী। আমরা আপনাকে চারি দিকে ঘিরে কাজ করব। কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর-এক দিন এসে বললেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জিলিং বেড়াতে যাও—তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বললুম, বিমল, দার্জিলিঙে বেড়াতে যাবে?

আমি জানি, দার্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব শখ ছিল। সেদিন সে বললে, না, এখন থাক্।

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা। ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনা সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি, এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নে, তা হলে বুঝব, এতিদন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সেদিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবর্দস্তি? কিসের জন্যে! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে!

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনিই জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়—দেশকে যেদিন লুট করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এইজন্যেই নীতিকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা একদল লোক আছে, নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামি সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে—তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবতখানায় রোশনচৌকি বাজছে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর। যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তো চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা করে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল। আসমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল না কি! আমার

সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চি-চি গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাই নে কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে। কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়ালে গেঁথে রাখতে চাও; সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে, তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ। আমার লোভ আছে, তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে। আর, যে-সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্যে এত চীৎকারে সে কথা কেবলমাত্র দুর্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে-সব কথা মানতে পারে না। কেননা, মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়; তার কারণ, কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না, তারাই কৃতকার্য হল। আর যে হতভাগারা এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

একদল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব; ওকে নির্জীব বললেই হয়। আজ চার বছর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি; কিন্তু কাকে জোর বল আর কোন্ জিনিসকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক—আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।

আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ।

নিখিলেশ বললে, হ্যাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো—তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এইরকম রূপক দিয়ে কথা কয়। তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে, তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এইরকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে তো থাক্। আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব। আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে। আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি। আমরা সকালবেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব, এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপক-ওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব, নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে

না। আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই—তা, এতে আমাদের বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চলছে তারা এই নিয়মেই চলছে, অথচ বলছে অন্যরকম কথা। এইজন্যে তারা জানে না, এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয়, জীবনে তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়। সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ-ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা—চাই-চাই খাই-খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে, এই দুর্দম ইচ্ছাই হচ্ছে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর-কাউকে মানতে চায় না বলেই চার দিকে জয়ী হচ্ছে। বার বার দেখলুম, আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে; তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি—অর্থাৎ, বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর-কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আসমানের দিকেই নিয়ে যাক—দেখি, তাদের সেই ফোয়ারা কত দূরে ওঠে আর কত দিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয় নি।

অ্যাফিনিটি! জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেছি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এই জন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল। অ্যাফিনিটি একটা কেন? অ্যাফিনিটি হাজারটা। একটা অ্যাফিনিটির খাতিরে আর-সমস্ত অ্যাফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরো-একটি পাবার পথ বন্ধ হয় নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তা হলে আমি কাপুরুষ।

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাই নি—আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণার মতো ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায় নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজো জা হাসতে হাসতে আমার স্বামীকে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়িতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল। এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বলো, ভাই ছোটোরানী? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে-সজ্জায় ভাবে-গতিতে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল, তার লেশমাত্র মেজো জায়ের চোখ এড়াতে পারে নি। আজ আমার এ কথা লিখতে লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা, সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে-সুঝে করি নি।

আমি জানি, সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভালো লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সামনে আমার স্বামীকে একদিন বললেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষীরানীকে আমি প্রথম দেখলুম—সেই জরির পাড়-দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে, যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এইরকম করে তাকিয়ে, তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মনে হল, ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন বাইরের কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই তো চাই, এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষীরানী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আর-এক দিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী; তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা। কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে এল; আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল। আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে-আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার

সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করলেন? তাঁর এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন—তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহানার মতো। তাই তিনি যখন আমাকে বললেন 'মউচাকের মক্ষীরানী', তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজো জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধে নি। আমি পারি, সমস্তই পারি। আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে—সে এমন-একটা-কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই-যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল এ জিনিসটা কী সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না। এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়। এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোটো বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সংকোচ বোধ হত, কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলই বলতেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গড়েছেন। শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল, আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি, সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাই নি।

দেশের চারি দিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আসত, সে-সমস্তই আমি পড়তুম এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক-এক দিন সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিলতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না। কিন্তু তার দুদিন পরেই সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনই আমাকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, দেখুন, সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল। এক-এক দিন বলতেন, আপনার যে পরামর্শটি নিই নি সেইটেতেই আমি ঠকেছি। আচ্ছা, এর রহস্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে, অথচ কাজে কর্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেইরকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ-সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে উল্টোরকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতেন। আমার স্বামীর এই সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধিবিপর্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে, যেন সেইজন্যই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারেই রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না—অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব—তাদের হৃদয়াবেগ যখন এক দিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে তখন অন্য দিকে তাদের আর কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যেই আমরা প্রলয়ংকরী। আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো কূলের মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচরজাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষীর বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তা হলে হয়তো লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনই জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা-ঘরে আমাদের সভাটা এমনি জোরে চলতে লাগল যে আর-কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা-ঘরে যখন মক্ষী আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির, খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তারপরে বাইরের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুলতে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি, দরজার দিকে পিছন করে মক্ষী শেল্ফ্ থেকে মনের মতো বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চমকে উঠে আপত্তি করে—তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম, এমন সময় সে পথ আগলে বললে, বাবু, ও দিকে যাবেন না।

যাব না! কেন?

বৈঠকখানা-ঘরে রানীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রানীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল। গলা একটু চড়িয়ে বললুম, আমি হুকুম করছি তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, বাবু যাবেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময় মক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করছে।

তার সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌-ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙা'। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে, যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা—সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেয়ে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওর রঙ শাম্‌লা। কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শাম্‌লা—কী তেজ আর কী ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে রানী বললে, নন্‌কু, চলা যাও!

আমি বললুম, আপনি রাগ করবেন না। নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্ছি।

মক্ষী কম্পিত স্বরে বললে, আপনি যাবেন না—ঘরে আসুন। এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মক্ষী একটা কাগজের টুকরোয় পেন্‌সিল দিয়ে কী লিখে বেহারাকে ডেকে বললে, বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বললুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য রাখতে পারি নি—দরোয়ানটাকে মেরেছি।

মক্ষী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই। ও তো কর্তব্য পালন করেছে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষী নিখিলকে বললে, আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য হয়ে বললে 'কেন' যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম। ভাবলুম, সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষী বললে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আসছিলেন, সে ওঁর পথ আটক করে বললে 'হুকুম নেই'।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই?

মক্ষী বললে, তা কেমন করে বলব?

রাগে ক্ষোভে মক্ষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর-কি।

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বললে, হুজুর, আমার তো কসুর নেই। হুকুম তামিল করেছি।

কার হুকুম?

বড়োরানীমা মেজোরানীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেলে মক্ষী বললে, নক্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম, ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খট্‌কা লাগল। ওর খট্‌কার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা। সোজা মেয়ে তো নয়। নন্কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। নিখিলের ভালোমানুষির 'পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুনলুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে—দারোয়ানজির তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে তো আভাসে বুঝতে পারছি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়—নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

এর ফল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে—কোনো-রকম প্রয়োজনের কিম্বা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।

এমনি করেই ভাবভঙ্গি ক্রমে আকার-ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায় জমে উঠতে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই।

এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্-এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছনো, সত্যের এ এক আশ্চর্য জয়যাত্রা!

সত্য নয় তো কী! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস; ধুলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধিনিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিস করে বানাতে বসেছে। যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন করবার ফর্মাশ। তার পরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম বল, বিশ্বাস বল—কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কত ধিক্কার, কত হাহাকার, কত শাসন—কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কথায়? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়। সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা—তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী? এই-যে পা কাঁপতে থাকা, এই-যে থেকে থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি। আর এই ছলনা শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়া-আবরণ পরে বেড়াতে হয়। যেরকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ, আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ, নির্দয়, যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড

পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে—তার পরে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। ঐ-যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে। ঐ-যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চলছে। ঐ-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু, রাশি-রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কাল-বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা। ঐ-যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গি, ঐ-যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ। অথচ, এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকছে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়। এইজন্যে তার গতিবিধি জানতে পারি নে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে; এইজন্যেই সাপের মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে! তারপর থেকে আর আরাম নেই। তারপরে মরণ আর-কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটোবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য! তার পরে মরণ-বাঁচন ভালো-মন্দ-সুখ-দুঃখ তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুচ্ছ!

আমার মক্ষীরানী স্বপ্নের ঘোরেই চলছে। সে জানে না কোন্ পথে চলছে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ করি নে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষীরানী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে থাকার অর্থটা কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুলতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা, দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করি নে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না, না, আপনি—

আমি বললুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে—ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আজ লজ্জার লেশমাত্র নেই।

অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখুন-না, আমি কিছু কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব—এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলন-নীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কী জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষীরানী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়ছে—পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আর-একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বললুম, দেখুন, আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের। কেননা, আমরা কেউ বা অ্যাটর্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার—আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেক রাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি। জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

মক্ষীরানী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্‌যোগ করতেই আমি বললুম, না, সে হবে না—আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্ছি।

আমার বইখানি টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়ে নি—তাহলে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।

মক্ষী বললে, কেন?

আমি বললুম, কেননা, এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূ কুঞ্চিত করে মক্ষী বললে, কেন বলুন দেখি?

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেইজন্যেই ওর সঙ্গে আমার আমার ঝগড়া বাধে। আপনি তো দেখছেন সেইজন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে—যেন ফি কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, এইরকম ওর মতলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ-ভাঙার দল।

মক্ষী বললে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কী?

আমি বললুম, আপনি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী স্বদেশ কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে; তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে। কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে, কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে—কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।

মক্ষী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে গম্ভীরভাবে বললে, স্বভাবের চেয়ে বড়ো হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয়?

আমি মনে মনে হাসলুম : ওগো ও রানী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌টস্‌ করছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে—এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কত দিন?

আমি বললুম, পৃথিবীতে দুর্বল লোকের সংখ্যাই বেশি; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঐ রকমের মন্ত্র দিনরাত পৃথিবীর কানে আউড়ে আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্ছে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত করে কাহিল করে রেখেছে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষী বললে, আমরা মেয়েরাও তো দুর্বল, দুর্বলের ষড়যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিতে হবে।

আমি হেসে বললুম, কে বললে দুর্বল? পুরুষমানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ করে করে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস, তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ংকরী হয়ে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি লিখেপড়ে দিচ্ছি। বাইরের পুরুষরা হাঁকডাক করে বেড়ায়, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখছ তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়েজাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকত তা হলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা সাজে সাজিয়েছে, নানা নামে পুজো দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্ত-মাংসের বাস্তবকে চেয়েছ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েছ, বাস্তবকে পালন করেছ।

মক্ষী শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না। সে বলল, তাই যদি সত্যি হত তা হলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে, তারা জানে পুরুষ-জাতটা স্বভাবতই ফাঁকি ভালোবাসে; সেইজন্যে তারা পুরুষের কাছ কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাব-মাতাল পুরুষ-জাতটার ঝোঁক বেশি, এইজন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে-ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়; আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না—পুরুষের জন্যেই তো যত রকম-বেরকমের মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাত দায়ে পড়ে।

মক্ষী বললে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন?

আমি বললুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না। আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে মাঝখানে কেবল, কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করি নে।

আমার মনে ছিল যে লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চলছে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি, যে কথা সেদিন বললুম, তার ভঙ্গিটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক। জানি, এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ। কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে। সেইজন্যেই পুরুষ পুজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেছে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাস্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু এই-সব মাস্টার-মশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল, তবু ইস্কুল পিছন পিছন চলল। সংসারে প্রবেশ করলে, সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুকল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুল-মাস্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর, আমাদের মক্ষী—তার মুখ দেখেই মনে হল যে এক মুহূর্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল; তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েন্টস্‌ম্যানের মতো পথের ধারে বসে থাকে, তারা ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সংকুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। 'মাপ করবেন—আমি'—কথাটা শেষ করতে না-করতেই মক্ষী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে আর বললে, মাস্টার-মশায়, যাবেন না, আপনি বসুন। সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাস্টার-মশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিম্বা আমি হয়তো ভুল বুঝছি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষী হয়তো আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাবছ তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছ। কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি। তাই করো-না। মাস্টার-মশায়দের তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি তো মাস্টার-মশায় নই। আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাই নে। আমি তো বলেইছি ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না; আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুললেন। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁকে একটানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়ো মানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো। তাতে তাদের মনে হয়, তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে; বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম—কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য আছে এ বদনাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না।

চন্দ্রনাথবাবু যখন বললেন, দেখুন, আমরা কোনোদিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকতে পারলুম না—আমি বললুম, আমরা তো ফসল চাই নে। আমরা বলি, মা ফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন; বললেন, তবে আপনারা কী চান?

আমি বললুম, কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

মাস্টার-মশায় বললেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বললুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়িহাতে বোর্ডে বচন লিখছি নে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেইটেই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব—তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন না-হয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কী বেশি? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্‌ফট্ করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছট্‌ফট্ করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিম্বা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছট্‌ফট্ করে নি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে, অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখন যাই মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বললুম, মক্ষীরানীকে এই বইটার কথা বলছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো-আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয়। আর এই ইস্কুল-মাস্টারের চিরকালের ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠকতে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে, তাই ওর সঙ্গে দেখাবিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ করে রইল। আমি বললুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে। এই-সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছে। তাই আমি বলছিলুম, এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললুম, তোমার কী বোধ হয়?

নিখিল বললে, এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো, যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বললুম, অর্থটা কী?

নিখিল বললে, দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই, সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে। আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এ-সব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোস্ট যার আলোতে আমরা এ-রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বললুম, দেখো নিখিল, ধর্মনীতির সোনা-বাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি। এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখ, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বললে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি নে।

তবে?

মিথ্যা তর্ক করে কী হবে? এ-সব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল, মক্ষী আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি, তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুল-মাস্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জানি, আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কি না। কিন্তু, বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিন্ত আছে সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বললুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বললে, তাতে ক্ষতি কী? ও বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে। এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবল দেহতত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়ো-জোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব তত্ত্বকে নিয়ে সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না। তোমরা

আমাকে বল, আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র। আমি নই, সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছে থেকে নয়।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি, তোমরা মানুষকে ছোটো করছ, অপমান করছ।

কোথায় দেখছ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও!

এ কী তোমার পাগলামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি—জেনেশুনে, বুঝেসুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল, আর মক্ষীরানী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ! ও বেশ বুঝেছে, ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয় না কেন? আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কী করে। বিমল যদি ওকে বলে, তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলে নি, তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে, তা হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মানলেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়। এ কথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ওরকম পুরুষমানুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি। ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্ররকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা।

তার পরে মক্ষী—বেশ বোধ হচ্ছে, আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন ওকে জেনেশুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে একবার পিছোবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর, আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে এক-এক দিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে 'যাও যাও' বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে—তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি। রাগ বল, ভয় বল, লজ্জা বল,

ঘৃণা বল, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে, আমরা যেমন করে আপিস করি—কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না—এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডারন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডারন্ নয়। 'মডারন্' এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে। কেননা, ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই—শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যাক। এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না, আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকারভর্তি করে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিল্‌মিল্ করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইছে।

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন?

মক্ষী একটু হাসলে; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষী একখানা বই তুলে তার পাতা ওল্টাতে লাগল। আমি বললুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনোরকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েছি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের—তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেইরকম ছিল। তখনো ইহকাল-পরকালের অনেক জিনিস বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে, কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই—ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল—আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবি নি। এখন প্রায় মাঝে মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর—সব জিনিসকে বড়ো বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই তো চলছে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্ছি খাচ্ছি; তাকে যদি এক মুহূর্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তা হলে কি মুখে অন্ন রুচত? না, চোখে ঘুম থাকত?

কেবল নিজেকেই সে-সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারি নে। মনে করি, কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হয়ে জমে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর—তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ্-না। সেখানে যুগযুগান্তের মহামেলায় লক্ষ-কোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিনরাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ—জান, বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে!

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায়, না, আমি আমিই, তখনই আমি বলব—সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী? ওটা কি একটা যুক্তি? ওটা কি একটা সত্য? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেরে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর, যা-কিছু পবিত্র, সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেছি। একদিনও ওকে ধুলোর উপর নামাই নি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তা হলে সেইসঙ্গে আমার—

ঐ দেখো, আবার গাম্ভীর্য! কাকে বলছ নর্দমা, কাকে বলছ ঘোলা জল? ও-সব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিস আর হবে না? বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ কথাটাই আরো বড়ো করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে! তা যাক। তাতে বিশ্ব

দেউলে হবে না, এমন-কি, তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো; সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে। এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে—

সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু, একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে ক'রে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মতো এ কথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে—সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসি নি। আমার যা বড়ো ব্যাবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্‌দোষ। আমি লোভী—আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই—তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফর্মাশ খাটছেন নাকি?

তা হলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে। মায়ার রঙে যে-সব চিত্রবিচিত্র করেছি, সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ কথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে। কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ম্বরসভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন—আমার নয়। আজ আমার এ কথা অহংকার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে না জানি ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে হয়, তা হলে আমি আবর্জনার মতো সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব, আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল—বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়; সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে-মানুষ-করা রোগা-আমি নয়; সে বিধাতার শক্ত-হাতের তৈরি আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাস্টার-মশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বললেন, নিখিল শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে। কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাস্টার-মশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোন নি কেন?

তিনি একটু হেসে বললেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব-যাব করছি এমন সময় আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল—আর তারই মধ্যে থেকে একটা বড়ো তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বললে, কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি; আমি বাসর-ঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন!

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয়-অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি, আয়নাটা আমারই করে নিই, বাক্সর ভিতরে রাখি, তখনই ছবি সরে যায়। থাক্‌-না! আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

একটা শয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এ-সব তোমার ছেলে-ভোলানো কথা! তা হোক-না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে—লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে—কত ছেলের কত কান্না! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না—সে সত্য, সে সত্য—এই-জন্য বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব। ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি হারিয়েছি, আবার দেখেছি। মরণের ফুকোরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না। যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলো-চুলের গন্ধ ভরে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা ভুল

করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোমটা-খোলা তারা আমাকে বলছে, না না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে—সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব, সব ভুল, সব কান্না, কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো-একটা জায়গায় থেকে যাবে। কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুকলেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী! লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও! তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারি নে।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি, ভয় করি নি। আমি জানতুম, দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উল্লাস! নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ, এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, তাঁর চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন-একটা ভয়ংকর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি দিনরাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল, বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।

আর, কৌতূহলের অন্ত নেই। যে মানুষকে ভালো করে জানি নে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্র শিখায় জ্বলছে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য—সে কী প্রচণ্ড! কী বিপুল! এ তো কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যে সমুদ্র বহু দূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেছি মাত্র—এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাঁকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমন-কি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে—কিন্তু বীণা তো বাজল। আর, সেই সুরে যখন আমার দিন-রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা-কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।

এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা—কী বলব—যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাস্টার-মশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে, তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্তেই বড়ো করে দেখতে পাই। বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেছি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু, কী হবে? আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক, এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে-পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিকে থাক্, এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়তে পারছি নে। আমার ননদ মুনুর স্বামী তখন মদ খেয়ে মুনুকে মারত, তার পরে মেরে অনুতাপে হাউহাউ করে কাঁদত, শপথ করে বলত 'আর কখনো মদ ছোঁব না', আবার তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে বসত—দেখে আমার সর্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক। এ মদ কিনে আনতে হয় না, গ্লাসে ঢালতে হয় না—রক্তের ভিতর থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে। কী করি! এমনি করেই কি জীবন কাটবে!

এক-একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন; এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগের সঙ্গে গোড়ার মিল নেই, এ যে মায়াজাদুকরের মতো কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙিন করে তুলেছে। এ যে কী হল, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

একদিন আমার মেজো জা এসে হেসে বললেন, আমাদের ছোটোরানীর গুণ আছে! অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না! আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না। তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তা হলে কিছুকাল টিকতে পারত—এখন বড়ো সন্দেহ। ছোটো রাক্ষসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছবি কিরকম হয়ে গেছে!

এ-সব কথা একদিন আমার মনে লাগতই না। তখন ভাবতুম, আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারি দিকে একটা ভাবের আব্রু ছিল। তখন ভেবেছিলুম, আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আমার লজ্জাশরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা—মডার্ন্ কালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি—সেই-সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাই নি। আমার মনে হতে লাগল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু, আজ আর কোনো আড়াল রইল না। কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে খাটাচ্ছেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে আলাপ-আলোচনা করছি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজো জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বললুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না, মরে গেলেও না।

দুদিন বাইরে গেলুম না। সেই দুদিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হল, যেন একবারে জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হল, কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে—যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে!

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল, তবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম। আলমারির ভিতর জিনিসপত্র এক ভাবে সাজানো ছিল, সে-সমস্ত বের করে ঝেড়ে-ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্য রকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকালে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলোচুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ারঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়াবে চুরি অনেক হয়ে গেছে; তা নিয়ে কাউকে বকতে সাহস হল না, পাছে এ কথা কেউ মনে মনেও জবাব করে 'এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা'।

সেদিন ভূতে পাওয়ার মতো এইরকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কী পড়লুম কিছুই মনে নেই, কিন্তু এক-একবার দেখি, ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জানলার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবনসমুদ্রের ও পারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি। নিজেকে মনে হল, আমি যেন পরশুদিনকার আমি'র ভূতের মতো—সেই-সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম, সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হতে লাগল, যেন উঠোনটার উপর, বারান্দার রেলিংগুলোর উপর রেগে রেগে উঠছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; যদি পারতেন তো খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাব মনে করছি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজো জা দাঁড়িয়ে।

'ওলো, অবাক করলি যে!' এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বললে, ছোটোরানীমা, ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বললুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্‌। এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে বিলিতি সেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময় বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, সন্দীপবাবু দিলেন।—সাহসের আর অন্ত নেই! বেহারাটা কী মনে করলে? বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। চিঠি খুলে দেখি, তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে : বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ।

রইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। শাড়িটা যেমন ছিল তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি, তাঁর চোখে এই জ্যাকেটটির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে-বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মিত সুপুরি কাটছেন। আজ আমি কিছুই সংকোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন, বলি, চলেছ কোথায়?

আমি বললুম, বৈঠকখানা-ঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম।

মেজো জা গান ধরলেন—

রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে।
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।

বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বললেন যে, আর্টিস্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাকতে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদলে এসেছে—সন্দীপের অহংকারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বললেন, তুমি কি ভাবো আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বললেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিস্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চলতে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাসলেন; বললেন, নিখিল, তুমি ভাবো দৈন্যটাই হচ্ছে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য ততই বাড়বে। আমি বলছি, অহংকার যার নেই সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত-রকম। এক দিকে ইচ্ছেটা—তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে। অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে—সে যেন দামী হীরের ঝক্‌ঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি, সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা, আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজও আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচে নি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

তাই একবার মুহূর্তকালের জন্য ভাবছিলুম, ফিরে চলে যাই। এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। বললেন, এই-যে, আপনি এসেছেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবি জন্মেছে তাতে আমার দু-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ! সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই!

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য দিকে চেয়ে ছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম, সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কী কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুললে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বললুম, আপনি কী দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চমকে উঠে বললেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব চেয়ে বড়ো তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী?

আমার বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল! বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আসছে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কী করে! আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেছি তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে কথা কি আপনাকে বলি নি? ভূগোলবিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয়! শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব, আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি। তবেই তো সেই

কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব, সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল। কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন সেই-যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল। সে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব! এইসব জিনিসই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বলতে বলতে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেইদিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে; তার অনেক কায়দা-কানুন আছে। কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে সত্য প্রতিদিনের শুকনো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্তি ধরে চারি দিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেছে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল, এখনই সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো করে তুলবেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবনমরণকে তুচ্ছ করতে পারি। সে কি কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না। আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায় তখন সংকোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। যত দিন আর্ট আর বৈষ্ণবকবিতা আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ-নির্ণয় আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল তত দিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠছিল। আজ সেই অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল; সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল, আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায় রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনই কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না? আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠছে না কেন, যা মন্ত্রের মতো এখনই সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়?

এমন সময় হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরের ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাত জন্মে এমন— হাউহাউ, হাউহাউ!

কী? ব্যাপারটা কী?

মেজোরানীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েছে।

আমি যত বলি 'আচ্ছা, সে আমি বিচার করব' কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকালবেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনই অন্তঃপুরে ছুটতে হল। দেখি, আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে এক-মনে মাথা নিচু করে সুপুরি কাটছেন; মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করছেন 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে'—ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব। দেখো দেখি, এই সকালবেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি করে দিলে! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখছি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছে—একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত—লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে! তা, ছোটোরানী, এ-সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না। তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মানুষের মন! এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে! এই সকালবেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে যাওয়া—আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হল যে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি, ঠিক সময় বুঝে মেজোরানী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি টল্‌মলে জায়গায় আছি যে এ-সব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে। এই তো সেদিন নন্‌কু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যেরকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্যন্ত তা টিকল না। দেখতে দেখতে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরানী এসে আমার স্বামীকে বললেন, ঠাকুরপো, আমারই অপরাধ। দেখো ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চাল-চলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না। সেইজন্যে ভালো মনে করেই আমি দরোয়ানকে—তা, এতে যে ছোটোরানীর অপমান হবে এ কথা মনেও করি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো। হায় রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে, পূজার দিক থেকে, যে কথাটাকে এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, চার দিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে। ঐ-যে মেজোরানী নিশ্চিন্তমনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছেন, ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ-সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব? না, ঘাড়-মোড় ভেঙে এমন সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমন করে ছারখার করে দিলুম কী করে!

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বউ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে আছে। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারত-সাগরের কোন্-এক দ্বীপের অনেক দামী এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই-কটি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া; ইন্দ্রধনু যেন ঐ-কটি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরে এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয় নি। আশা আছে, আবার আর-এক দিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য এই যে, অভ্যাসমত আজও এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্ছি। আশ্চর্য এই যে, সেই নারকেল-দড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আলগা হল না—তার পাতাগুলি আজও সবুজ আছে।

আজ চার বৎসর হল, আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুলতে পারি নে। আজ ছদিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেছি। কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে তুলে পুজো কর, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বললেন, শুধু লজ্জা নয়, ঈর্ষা।

আমি বললুম, শোনো একবার কথা! তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বললেন, ঐ মিথ্যে-আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি, সামান্য-আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে, তাই আর-একটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্ছ।

আমি বললুম, তোমার এই কথাগুলো শুনলে আমার রাগ হয়।

তিনি বললেন, রাগ আমার উপর করে কী হবে, তোমার অদৃষ্টের উপর করো। তুমি তো আমাকে স্বয়ংবরসভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী

স্বয়ংবরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন। তোমরা স্বয়ংবরা হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুলতে পারি নে।

ঐ-যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানা-ঘর ঝাড়পোঁছ করবার উপলক্ষে সেই ফোটোস্ট্যান্ডখানা তুলে এনেছি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পুজো করি নে, তাকে আমার প্রণাম করা চলে না; সে রইল আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর মধ্যে ঢাকা। সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক। ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উসকে তুলে তার সামনে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি, এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই—আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি-বন্ধ করে রাখি। কিন্তু পোড়ারমুখী, এই হীরে-মানিক-মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে! এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে! তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে! মরণ হলে যে বাঁচি।

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বার বার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে 'আমরা চাই'; সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টিকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা, 'আমরা চাই!' 'আমি চাই' এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী। সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে আগুন হয়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে। ভয়ংকর তার প্রণয়ের পক্ষপাত—মানুষকে সে কামনা করছে বলেই যুগযুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেছে। সৃজন-প্রলয়ে সেই ভয়ংকরী 'আমি চাই' বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী। সেইজন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। জমছে, জল জমছে। হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর। আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না, পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে। তখন এতদিনের বোবা শক্তি 'আমি চাই' 'আমি চাই' বলে গর্জন করতে করতে ছুটবে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি, আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা; সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! 'আমি চাই' এই কথাটাকেই

নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ। না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি—আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে, অপমান করে, এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই বলে তখনই ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে! আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে!

সন্দীপের আত্মকথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কী সন্দীপ! আমি কি কথা দিয়ে তৈরি! আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই!

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদী সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে—সেই বাষ্পে সে ঘেরা। তার চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে, সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে, এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ-মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এইজন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট; যেখানে তার ভিতরে জলস্থল, সেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না। মনে হয়, সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে, যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি। কিন্তু আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে, যা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নি, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান—আগ্নেয় পর্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ংকর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চার দিকের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বলো, জাত বলো, এ পর্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেছে। ১-কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে; নইলে ১-এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকে প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয় তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি-না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে—সে নেহাত কাঁচা—অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চেলাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল; আমি সবাইকে বললুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আনতে পারে? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল, আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ, সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে। কিন্তু যেখানে আমি, নিজের দোষে না ভাগ্যদোষে, দুর্বল, সকরুণ—যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জমে উঠছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে। কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না; এইজন্যে তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ জিনিসটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জানতে চাই। সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্বিজয়ী সেকন্দর থেকে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রক্‌ফেলার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিংবা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেছে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেছে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি, আপনাকে জানো। সেও বলে, আপনাকে জানো। কিন্তু, সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই, আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি যাকে ফল-পাওয়া বলো সে হচ্ছে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেহাত ঝাপসা হল।

নিখিল বললে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বলব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখছ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভ্রূর মাঝখানে?

সে বললে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জানছে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তা হলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কী বলবে?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায়। যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোওয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেছ?

মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই; বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই, কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারি নে তা নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুশকিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম, সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি, এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এইজন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো, দেশের ধুয়ো, দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি। ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই। তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে। আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো; আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখব, সানাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন কদিন ধরে মাথায় ঘুরছে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে দিচ্ছি? আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে চলবে।

সেই কথাই তো বলছিলুম, যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেছে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও আমাকে চায়। ঐ তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে। সেই বোঁটার দাবিকেই চিরকালের বলে মানতে হবে নাকি? ওর যত রস, যত মাধুর্য, সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই। সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা; সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে, আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে। আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে। তার লক্ষ্য সে জানে না, শুধু আমিই জানি। কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে, কাদায় তার গা ভরে যাবে; তাকে বিচার করতে দেব না—তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে! তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল। কিন্তু আমি করছি কী! দিনের পর দিন আমার কী নিয়ে কাটছে! ও দিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল!

আমার ধারণা ছিল, আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি। ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই, কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু, এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়।

তাই তো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ তো পাকা হয়ে ধরে না। হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয়ই দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই, এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি. এ. পাস করেছি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়ছে বললেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম, নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেবে না। জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস বুনোনি? এ যে জালের মতো। সূত্র বরাবর চলেছে; কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলছিলুম; আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি, মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে। 'আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে, ছিঁড়ে নেব'—এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা। এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চলতে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে, এই কথা আমি চিরদিন বলে আসছি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখছি, বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্ করছে। তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয়, কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত। ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেই-জন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে। তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।

আমি জানি, দুবার-তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না। সেও বুঝতে পারছিল, এখনই একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য একেবারে বদলে যাবে। সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি। এই সময়টুকুর মধ্যে একটা-কিছু স্থির হয়ে যাবে তারই জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিশ্বাস রোধ করে যেন থমকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু, সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি। নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর

থেকে বুঝতে পারছি, এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত। এইরকমেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর মোলো নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবি নি; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তার কাছে লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টও বোধ হচ্ছে। এক-এক দিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব করে গল্প করতে, তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এমন-কি, যা কখনো করি নে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিসটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না—এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই-সব হচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মানবামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করি না কেন সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসংকোচে জানাতে চাই, এ-সব জিনিসকে বড়ো করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে, এইবার আমাকে দুর্বল করেছে। আমার এই দুর্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি। আমার অসংকোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে। তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ংবরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে, কিন্তু সেটা দেখে ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ; এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে; বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা

খুলবে; সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারি দিকে গর্জন আর ফেনা—সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম। সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টল্‌মল্ করছে। কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিল্‌মিল্ করছে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্ করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠছে—এই শরতের প্রভাতসংগীতে আমিই কেবল বোবা। আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ; আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি, পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পারবে কেন!

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো। বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে!

হায় রে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এত কাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে। কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর!

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহর বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণাপঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যাবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে *ঠেকত* তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়। জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে। এই ছল্‌ছল্-করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারা রাত আড়ি পাতছে—সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে

নয়। তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম-মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানসসরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দু বছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেছে। তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্র মাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেছে সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি নে, প্রথম তিন দিন তো কেটে গেল; বিমলের মনে পড়েছে কি না জানি নে, কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল, গান থেমে গেছে।—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে। কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়!

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগছে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব, এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও। দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার।

আমার মনে হচ্ছে, যেন এইবার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারার কিনারায় এসেছি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এত দূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আনতে পারছি নে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে, এমন পূজা আমরা মানব না। সাজে-সজ্জায়, লজ্জা-শরমে, গানে-গন্ধে, হাসি-কান্নায়, যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার জোগাচ্ছে, জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ন করতে মানুষ পারে কী করে! এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েছে! আমি যে-মদ এতদিন পান করছিলুম তার রঙ এত লাল নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনিই তীব্র। এই নেশার

ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্‌গুন্‌ করে মরছি—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,

শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না! এত বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল! একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল!

শোবার ঘরের শেল্‌ফ্‌ থেকে একটা বই আনতে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কত দিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকি নি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো শাড়ি পাকানো রয়েছে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের শিশি, সেইসঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও। টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি-দেওয়া চটিজুতো—একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্যন্ত এই জুতো পরে যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেছে, কিন্তু এই চটিজোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পুজো কর—আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পুজো করতে এসেছি। বিমল বললে, যাও! তুমি অমন করে বোলো না, তা হলে কক্‌খনো ও জুতো পরব না।—এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর; এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে, আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই-সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করি নি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটিজোড়াটা পর্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্ন পদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনিই রয়েছে, তার সামনে অনেক দিনের শুকনো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতরো পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার! এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্তিতেই গ্রহণ করলুম—কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্বিকার হতে পারব?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেল্‌ফের দিকে যেতে যেতে বললুম, আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল বইখানা নিতে এসেছি। এই কৈফিয়তটুকু দেবার কী যে দরকার ছিল তা তো জানি নে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা

লুকানো যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো—কিছু দেখতে বা শুনতে, বলতে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না—যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট হয়ে, অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসল—ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি পঞ্চু? এ কেন?

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাস্টার-মশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপরে সে গরিবের একশেষ; ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাবছিলুম, বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বক্‌শিশের ছলে অন্নসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্ছি তখন ও জোড়-হাত করে বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সেকি পঞ্চু?

না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারি বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্‌ দিন মরব, তাই শোধ করে দিতে এসেছি।

আমিয়েল্‌স্‌ জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না। কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি!

পঞ্চু আমার মাস্টার-মশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা, রঙিন সুতো, ছোটো আয়না, চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটুজল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে; তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে এক-ঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক-বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাস্টার-মশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পার, দুঃখ নষ্ট করতে পার না।

আমাদের বাংলাদেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।

এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম, এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূল-ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। দেখো, শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল, স্বভাবত, যাকে বলে 'মহিলা'। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেছে, কিন্তু ও রানী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর তাদের সুখদুঃখ ভালো-মন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিঁকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে, যাতে করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ অনুযায়ী একটা কৌলীন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি, আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি বিমলকে জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই দিন-রাত সাজিয়েছি, পরিয়েছি, শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি— মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টার-মশায়—তিনিই আমাকে যতটা পেরেছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এইজন্যে যে, আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে! উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেইজন্যে আর-কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব করি তখন এক দিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেছেন তার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি মাস্টার-মশায়কে বললুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বললেন, দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি। তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন, কোনোমতেই আমার গাড়ি-ঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বলতেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আপিস করে আমাদের মানুষ করেছেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বললুম, না-হয় আমাদের বিষয়কর্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বললেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়োমানুষির ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাকতে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম.এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে। আমি বললুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায় নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনই আমি উৎসাহ করে চন্দ্রনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে না।—তাকে এত বড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ করেছে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙ্গুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এন্‌ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাস্টারি করেন। এত দিন তিনি আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতেন না, এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধেবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা দুপুর পর্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আসছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন, তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্র মাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চর্য এই, বড়োমানুষের 'পরেও তাঁর গরিবের মতোই সমান দয়া, বড়োমানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে—আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন—

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া?

যত দুঃখ, যত ভুল, সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন-রাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও!

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারি নে। ষাট হাজার সগরসন্তানের ছাইয়ের 'পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল—কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না—সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল, বললে 'এই-যে আমি'!

বইয়ে পড়েছি, গ্রীক দেশের কোন্ মূর্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন—কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়! সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিস হত তা হলেও তো বুঝতুম অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ-যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়। এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠল 'অয়মহং ভোঃ'।

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ। সেইজন্যে মনে হল, আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, এই হল বলে, হল বলে।

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পক রথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়—আর, তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর-একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় কেবল

দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই, তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বললেন, দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মানো না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন আর, তুমি অবিশ্বাস করছ!

আমার স্বামী বললেন, আমি দেবতাকে মানি, সেইজন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এইরকমের কথায় আমার ভারি রাগ হত। আমি তাঁকে বললুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা, এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বললেন, শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বললুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ। আর, অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বললেন, দাম দেব গো দেব।

স্বামী বললেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রোশনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বললেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না।

ব'লে তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—

আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হালকা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুলব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোওয়াবি।
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক-না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা, নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়। রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে—
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরান পূরে।

আসল কথা হচ্ছে, নিখিল, আমাদের মন ভুলেছে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টিকতে পারব না, আমরা অসাধ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে—
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙেচুরে।

মনে হল, আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে। কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই-যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিন-রাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, একটা কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল বলে—তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি না, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো, এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম, বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা। তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে 'বন্দে মাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে, বন্দে—কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল। এক-এক দিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারও পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মতো অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি, এই সুপ্ত রাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকছে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে, 'যেন পেয়েছি, যেন পৌচেছি, যেন এখন চোখ বুজে চললেও কোনো ভয় নেই।' না, এ তো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ

আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ। সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য. দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে—কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজালো সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের, সব যাবে, আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে! তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলাদেশের সময়ের কলে পুরো ইস্‌টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের যে কোণে আমরা থাকি এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এমনি মনে হতে লাগল। এতদিন আমাদের এ দিকে বাংলাদেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিকে থেকে কারো উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বলতেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক; কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু, তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তাঁর চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাকল—তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সরল সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাদের আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্‌সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন। কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা

আর-কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন?

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব, ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি। ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বলতেন, ঠাকুরপো, শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি। আমাদের তো ভাই, সাবান মাখার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না থাকে তা হলে মাখতে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেক দিন তো ছেড়েই দিয়েছি, তবু সাবান না মেখে আজও মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুশি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আসতে লাগল। সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা! আমি বুঝি জানি নে? স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সাবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলছে; একদিনও কামাই নেই। ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়কাচা চলতে লাগল।

আর-এক দিন এসে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে? সে তো আমার চাই। মাথা খাও, আমাকে এক বাণ্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজোরানীর ঘরে বোঝাই হতে লাগল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধে ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বললেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব শজনের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেছি, লেখার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালেভদ্রে লেখার শখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপর হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিই নে সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বলবার জো ছিল না। বলতে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাকতেন যে, বুঝতুম যে উলটো ফল হল। এ-সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠকতে হয়।

মেজোরানী সেলাই ভালোবাসেন; একদিন যখন সেলাই করছেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বললুম, এ তোমার কী কাণ্ড! এ দিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির

নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!

মেজোরানী বললেন, তাতে দোষ হয়েছে কী? কত খুশি হয় বল্ দেখি। ছোটোবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর তো কোনো নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই—এইখেনেই ও মজবে!

আমি বললুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোরানী হেসে উঠলেন; বললেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেতকাঠির মতো! মেয়েমানুষ অত সোজা নয়—সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজোরানীর সেই কথাটি ভুলব না, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজবে।

আজ আমার কেবলই মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই, কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জোলার এ ধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ও ধারে প্রতি শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেছে। আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাট-বাজার আমাদের হাতে আছে, এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে। এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবরদস্তি চলবে না।

আমি একটু অহংকার করে বললুম, আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

আমি জানি, আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাকত তা হলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবি করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত। তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী। তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন। তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতন্ত্রের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি; যখন

কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক-এক দিন গান ধরতেন—

যখন দেখা দাও নি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি। নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে; আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁওয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না; আর, মুহূর্তে মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে, ঐ আমার ভক্তকে—ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওর মধ্যে প্রতি ক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন। এক দণ্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম, তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল। বুঝলুম, সে আদ্যাশক্তিকে দেখতে পেয়েছে। বুঝতে পারলুম, ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বললেন, এ কী মন্ত্র তোমার! ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পলতেয় এক মুহূর্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কে! একে একে সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগবে।

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম ভক্তকে আমি বরদান করব। আর, এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে একরকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন; আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, ঘাড় জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন। কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল; তার ঊর্ধ্বে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল-তোলা ঘাড়ের উপর—হায় রে, সে কথা আর কেন!

তার পর তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো সত্যমিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত। কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষই বন্ধ হয়ে গেছে, বানাবার শক্তিও নেই।

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বললুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের?

সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বললে, মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও তো গতি করা চাই।

আমি বললুম, পাপই যদি হয়ে থাকে এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি।

সে বললে, আজ্ঞে, কম কী। ডাক্তার-খরচায় জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। কিন্তু দান-দক্ষিনে ব্রাহ্মণভোজন না হলে তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে! মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে।

একে তো পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁষে কাটিয়েছে তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনোরকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি শুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্ছে না সেইটেই ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে, সংসারটা কিছুটা না, সুখ যেমন নেই তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাস্টার-মশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করছেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বউকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে এক মাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকালবেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেছে। যখন তার বড়ো ছেলে-মেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'বাবা, তুই কোথায় গিয়েছিলি', সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে—তখন কান্নার পর কান্না, কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাস্টার-বাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার ওদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন! আমি কী পাপ করেছিলুম!

এদিকে যে-ব্যাবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ-যে মাস্টার-মশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল; তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষকালে মাস্টার-মশায় তাকে বললেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও, নইলে তোমার ঘর-দুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের ব্যাবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল। মনে করলে, দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টার-মশায় যখন হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে—এমন উপকারের মূল্য কী!

মাস্টার-মশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ। তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা হয়।

হ্যান্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টার-মশায়কে খুব বড়ো করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাস্টার-মশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি। ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু ধুতি-শাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষীদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু বা ধান, কিছু বা পাট, কিছু বা অন্য ফসল যা হাতে হাতে আদায় করে আনত সেটা দামে কাটা যেত না। দুমাসের মধ্যেই সে মাস্টার-মশায়ের এক কিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণ-শোধের অংশে প্রণামের থেকে কাটান পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, মাস্টার-মশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এই রকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুল-কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল; তাদের অনেকে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশীপ্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এনট্রেন্স্ পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, সে আমি পারব না।

তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরিবের লোকসান।

মাস্টার-মশায় ছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তারা বললে, দেশের জন্যে—

মাস্টার-মশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ! এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ—তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ—তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু এদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ-নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে। ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না। ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়! জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে। আর, আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও? তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো এদের কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত। আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সকলেই মাস্টার-মশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না; কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে? আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন?

আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েছি। এমন-কি, অন্য এলাকার হাটেও আমার সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়। তার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাস্টার-মশায় বললেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যার ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন জোলাকে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে? না, তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ, ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

সায়ান্স্ ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি।

মাস্টার-মশায় বললেন, শুনবে? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে। তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে। তারপরে বাবাজির যেরকম ব্যাবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো। সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন; সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না। ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে। আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টার-মশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে আমি কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে—সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন বলে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন—আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?

আমি বললুম, না, সরাব না। কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে?

মাস্টার-মশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে। সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চস্বরে 'বন্দে মাতরং' বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টার-মশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?

ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা করেছে।

কেন, ওর অপরাধ কী?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্ তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে? লাগাও জুতি! এই বলে এক-চোট অপমান তো হয়েই গেল, তার পরে একশো টাকা জরিমানা। এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দে মাতরং। এরা দেশের সেবক!

কাপড়ের কী হল?

পুড়িয়ে ফেলেছে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল, বন্দে মাতরং! সেখানে সন্দীপ ছিলেন, তিনি এক-মুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব, বিলিতি ব্যাবসার অন্ত্যেষ্টিসংকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র। এই ছাই গায়ে মেখে ম্যাঞ্চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।

আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।

পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষি দেবে না।

কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষি দেবে না?

সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু, আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।

আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে।

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই—যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব?

অতএব, তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষি বলো আমি সেই মিথ্যে সাক্ষি দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বলবে তোমাদের সুবিধের জন্যেই। শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে। তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাকবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যে দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিকবে।

মাস্টার-মশায় আমাকে বললেন, এ-সব তর্ক করবার কথা নয়, নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে এ কথা যে লোক নিজের ভেতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে, সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়।

সন্দীপ হেসে উঠে বললে, আপনার এ কথা মাস্টার-মশায়ের মতো কথাই হয়েছে। এ-সব কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখছি বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য। আর, সেই লক্ষ্যকে যারা বড়ো রকম করে সাধন করেছে তারা ব্যাবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন করে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি যখন কংগ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি। আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্ম-নীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

মাস্টার-মশায় বললেন, সত্যফল-লাভ।

সন্দীপ বললে, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর, যা সত্য, যা আপনি জন্মায়, সে হচ্ছে আগাছা, কাঁটাগাছ; তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাস্টার-মশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উলটো দিকে গিয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।

তিনি বললেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারছি। আমি অনেক দিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন-কি, এক-এক দিন আমার সন্দেহ হয়েছে, এর মধ্যে তোমার দুর্বলতা আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।

আমি কৌতুক করে বললুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি 'প্যারাডাইস লস্ট্'এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন।

মাস্টার-মশায় বললেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায়।

আমি বললুম, আপনি বলেছিলেন, যে বিঘে-কয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাঁচিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করেছে। ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর, ওর একশো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর, ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি ওকে কে বাধা দেয়।

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই—পুলিসের দারোগা থেকে উকিল ব্যারিস্টার পর্যন্ত শকুনি-গৃধিনীর পাল জমে যাবে; সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমিই মরব।

কেন, তোর কী করবে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে সুদ্ধ নিয়ে পুড়ব।

মাস্টার-মশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাকবে; তুই ভয় করিস নে। তোর ঘরে বসে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যাবসা কর্, কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি, এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেস্ট্রি করে আমি দখল করে বসলুম। তার পর থেকে ঝুটোপুটি চলল।

পঞ্চুর বিষয়সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারেশ কেউ ছিল না, এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি করে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক হয়ে বললে, আমার মামী তো বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয় পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু, মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেছে দ্বিতীয় পক্ষের তো সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয় পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয়, মৃত্যুর পূর্বের। সতীনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায়। কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা এ-সব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারো কারো জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চুর এই দুর্‌গ্রহ নিয়ে যখন আমি খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠলুম; জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাকছে?

বললে, রানীমা।

বড়োরানীমা?

না, ছোটোরানীমা।

ছোটোরানী! মনে হল, একশো বছর ছোটোরানী আমাকে ডাকে নি।

বৈঠকখানা-ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চললুম। শোবার ঘরে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য হলুম যখন দেখা গেল, সর্বাঙ্গে বেশি নয় অথচ বেশ একটু, সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখি নি, সব

এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল; সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুত বেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্ছে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী করলে ভালো হয়?

ঐ জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো-না।

জিনিসগুলো তো আমার নয়।

কিন্তু, হাট তো তোমার।

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিস কিনুক-না।

যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কী কথা! ওদের এত বড়ো আস্পর্ধা হবে? তুমি হলে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা। সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিনরাত্রিকে জপমালার মতো ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্মভারের সীমা নেই, অথচ মুক্তিবেগেরও সীমা নেই। কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজে বার বার জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ তোমার এ হল কী?

প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না; তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েছে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য হলুম, আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যেরকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাত করে দেখি নি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল—আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখলুম, লেশমাত্র কুয়াশা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত-মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম তখন একদল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কী কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েছে; বারান্দার সামনে দক্ষিণে খোওয়া-ফেলা রাস্তার দুই ধারে সারির সারি কাঞ্চনগাছ অজস্র গোলাপি ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্ছে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মরে কীট উদ্ধার করছে—আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেছে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারই স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেছি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চনফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়ছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সংগীত বাজছে সে কী উদার, কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর।

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা-পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরিব রায়তের প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম, পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটা-কাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু; সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষবুদ্‌বুদ উদ্‌গার করছে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে—এই কাজটা মুলতবি হয়ে পড়ে রয়েছে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা : আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে—যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী। আর, ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন পাই, তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যাভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার জয় হবে—আমি সহজের

রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। সহজ চোখে সব দেখছি। আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম। যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি, বেদনায় বুকের নাড়ীগুলা আবার এক-এক দিন টন্ টন্ করে উঠবে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েছি। তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি, সে কেবলমাত্রই আমার; তার দাম কিসের! যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য; বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও; কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়ো না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলা-পথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক; আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে। কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। বুঝলুম, নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা যেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য—এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই। কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব, তার আর অন্ত নেই। ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুলমাস্টার; তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব। আর, ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স।

তাই সেই অশ্রু-ভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্থর্ করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম।

আশ্চর্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল। বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এ পার থেকে ও পারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল। কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল! অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না! বুঝতে পারলুম, জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই

তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো-একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে; এই কেবল বুঝি, সেটা একটা বাধা। এই বুঝি আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য-দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য; সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান—ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে-দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে, তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্যে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বললুম, বাধা আছে; কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল, রানী?

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হ্যাঁ।

আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা করতে লাগলুম—এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্‌ সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে।

এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পর আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমলা বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল। করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে, অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল, তাকে এখন বিদায় করে দিই। কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল, স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পর চলো রণক্ষেত্রে। হর হর ব্যোম ব্যোম!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে।

মাড়োয়ারিরা বলছে আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।

একটা চাষী তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-কটা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরি শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্‌বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায়? আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যাবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যাবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব?

আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বকশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষীর খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব মারো, রাধাভাবে ভোর হয়ে 'ক' বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষীর ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনো তাই করবে। তাতে তাদের শখ মিটবে না জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান; সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুন্দদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কি না। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না?

আমি বললুম, দায়টাকে কারো ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ো-পড়ো হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মিরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললে, হুজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন—

আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে?

তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না, হুজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে—এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকার জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।

বিকেল-বেলায় বিমলা ঘরে আসবা মাত্র চৌকি থেকে উঠে তাকে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, টাকা? কত টাকা?

আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কী করে বলবে যে, পারব না।

আমি বললুম, রানী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, দেব।

আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে, ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা দিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব?

আমি বললুম, তাঁর টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের; দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যার টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দে মাতরং! 'বন্দে মাতরং' এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর খুলবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো—বন্দে মাতরং!

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষ-জাত। বিধাতার ভাণ্ডারে কোনো লোহার সিন্দুককে আমরা রেয়াত করি নি। আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।

এই পুরুষদের দাবি মেটানোই হচ্ছে রমণীর আনন্দ। দিন-রাত সেই অন্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে, সার্থক হয়েছে; নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত; তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, তার শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম, ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষ-জাত এইজন্যেই তো সকর্মক; আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবা মাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষ-মানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তাছাড়া আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে। এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম; কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাকরা গাড়িতে ওর চন্দ্র-মাস্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দুদিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের ছদ্মবেশটা দুদিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু, বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে, সেই দু-চার হাজারেই ঠেকবে। তাই সই। 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' বলেছে, কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো-আনা, এমন-কি, পনেরো-আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি—এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই। শুনছি, একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে। লোকটা পুরোনো দাগী; তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি! বিশেষত, নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায়?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছি প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন

বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দে মাতরং, আর সেও বলছে বন্দে মাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক; যেটুকু পদার্থ টিকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা নাকি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে, তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন; নিজের ভিতরে কিংবা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দে মাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে। সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে—তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দে মাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি; কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই, বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক, টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনই যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই-সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টার-মশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছ'টা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম-দুটো এবং শেষ-দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্য কালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না। সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্‌গর। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে।

এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চলছে তখন সেটা তর্কে এসে নাববে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কী হবে? এখন আমার কাজের ভিড়। অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক্, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।

এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে; ওদের জানা চাই, জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে 'হাঁউ' করে ওঠে; একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে; নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী?

নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটিমাত্র পথ আছে।

আমি জানি সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে। সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুল্‌বয়। গুণের মধ্যে ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়; ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে, তার উপরেও কিছু আছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না; যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে; সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ। মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না, আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে—মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যে অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে; তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে। এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিণেরও অন্ত নেই, অথচ এত বড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি; কাজে লাগাচ্ছিনে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক-দল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে; আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি!

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যেরকমের স্বভাব কিংবা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছে।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাকতে পারে কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল হুহু করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বলে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা

তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই পুজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নামতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে; সেইজন্যই বলছি, এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমি দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা। তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা, বাঙালির যে একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে, কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে বলে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানদের শাসনকালে বাঙালি যে দেশ-শক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এ দুই দেবী তারই দুইরকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্য রূপ ভারতবর্ষের আর কোন্‌ জাত গড়তে পেরেছে।

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল, বাঙালি তার দেবমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল— কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভালো। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যেরকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে সেরকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষী যেরকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেইরকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি; জানি নে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্তলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা একরকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

এই প্রথম বিমলা আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথি রূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারই কালো চোখের কাজলমাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহুদূর পারের বনরেখার মধ্যে; আর, কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরে-শাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায়; আর, তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা-হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। 'তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'। কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে, কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে আসনে বসেছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছে, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে, তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধি-বিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে! রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি। সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল।

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না, কান্না, কান্না!

এই তো হিপনটিজম্। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে, সত্যমেব জয়তে! জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল, তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দে মাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা: সে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললে, তুমি গরিব কিসের! যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনোদিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদান-রূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোলভাবে চলে। কিন্তু এত বড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটি কি বলা চলে? কিন্তু আর সময় নেই।

সংকোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় বলে!

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এ নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েছে; বোধ হয় সারা রাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর-কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই; হিসেব করে দেখছি, পাঁচ হাজার, এমন-কি, তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব! যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,

সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে, যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা—'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'। 'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল!' বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর; অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত—'কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী? আর, আমি মেয়েমানুষ অত টাকা পাবই বা কোথা?' ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য; সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক। এই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়। আমার বড়াই, আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফস্‌কাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে।

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পুজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পুজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকার রুইমারিতে অঘ্রানের শেষে যে হোসেন গাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পুজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে, এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম। যারা ন বছর দিন-রাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে ঘরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই। আজ ওরা বুঝতে পারছে, কোনোদিন যে দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে!

যাক! যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, এতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়োরকম ভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়—

আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা, কালই এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে। শুনছি, একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে, তারও উদ্‌যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেইসঙ্গে অজস্র মিথ্যেকথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে, এই পঙ্কিল রসের হোলিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না। দুই-একজন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে : স্বনামা পুরুষো ধন্য; কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফরমাশ দিয়েছে, সে খবরও আমরা রাখি।

আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরে অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এতদিনে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দে মাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানি চিঠি এসেছে; তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে : ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন, মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম সই করেছে : মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

আমি জানি, এ-সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি. এ. গম্ভীর ভাবে বললে, আমরাও শুনেছি, দেশে এক-দল লোক মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললুম, তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে; আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক-চুল মাথা নিচু করবে না।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয়?

আমি বললুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই?

আমি বললুম, কে বললে নেই? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যাবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করছে।

এম. এ. বললেন, তাহলে ঐ দাস-ব্যাবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি. এ. বললেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। এই যে ও পারে হরিশ কুণ্ডু আছেন জমিদার, কিংবা সানকিভাঙার চক্রবর্তীরা, ওদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাকে বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেননা, বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেছেন। যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ. এ.-প্লাক্‌ড্ ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি। চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে বেরোলো; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম।—এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এই-সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে; এরাই তো প্রভু। যারা ষোলো-আনা ইচ্ছে করতে জানে না, তারা হয় এদের

ইচ্ছেয় চলবে নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে।—তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আজ চক্রবর্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে, অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বললুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাই নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বললেন, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি—পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে, কেননা এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উলটো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল—একটা মুসলমান প্রজার বেচে-কিনে নেবার মতো কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, তো বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাত্রে ঘুম হয় নি। কিন্তু যতই কষ্ট হোক, আমি এটা শিখেছি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে মানুষ-হিসাবে সে আমার চেয়ে বড়ো—আমি পারি নে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, তাই যদি হয় তবে এই-সব গোমস্তা, এইসব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সে'ই সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই ধর্ম বলতে শিখেছ, সেইজন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ। আমার লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে।

আমার এ-সব কথা অত্যন্ত সহজ কথা—সরল লোককে বললে বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম. এ. ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষছে, সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এ দিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবছি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন-কি, সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে ঘটনা ঘটে নি, জোগাড় করতে পারলে, তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেছি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাস্টার-মশাই বললেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মানতে পারব না। আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন?

হাঁ, আমি।

এ-সমস্ত মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার—মাস্টার-মশাই যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন; চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চার দিন দেরি হবে। আমি ভাবলুম সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্য তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই-বা চলে গেছেন। তা যদি হয় আমি জানি, সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রীপুজো মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল, তাই স্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

•

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তারা 'বাহির' বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ে, আলো-অন্ধকারের সমস্ত মিড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চার দিকে ভিড় করে দাঁড়ায়; তখন মনে হয়, জীবনে এ ছাড়া আর-কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্তের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই; এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জলস্থল-আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সে প্রাণই একের মধ্যে মুদে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে : সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত। মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক-না সে সত্যের মজুরি, ধর্মের মজুরি। সেই তারার-আলোয়-ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের-অমৃতে-ডুবে-মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মতো হারালি, নিখিলেশ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে-জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কী ভয়ানক একলা!

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌঁচেছে তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাস্টার-মশায়ও ছিলেন না; শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়ি-ভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো শখ। আমি টবে করে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে

সাজিয়েছিলুম; যখন সমস্ত গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত, সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেছে। কিছু কাল আমি বাগানে যাই নি; আজ মনে মনে একটু হেসে বললুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসি গে।

বাগানে যখন ঢুকলুম তখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখে বাড়িয়েছে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া, তারই উপর দিয়ে বাঁকা চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে। ঠিক আমার মনে হল, চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাসছে।

পাঁচিলের যে ধারটিতে গ্যালারির মতো করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি, সেই পুষ্পিত সোপানশ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

তার পর কী করা যায়! আমি ভাবছি, আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কি না। বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল, সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত চলে যাওয়াও তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা!

সে চমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই পিঞ্জরের মধ্যে চারি দিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না!

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে!

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি, অন্তত আমি তোমার হাতের হাত-কড়া হব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না, না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি, আমি সুখ না পাই নেই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাস্টার-মশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলছে। মাস্টার-মশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম, মাস্টার-মশায়, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই না।

মাস্টার-মশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি, পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর-কোথাও করতে হবে। আর-কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টার-মশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা। কিন্তু আসলে যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বললুম, মাস্টার-মশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাকপড়া উপদেশের মতো শোনায়। কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেও দেখি তখন যে দেখি, ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জান্ডার করেন নি— এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মাস্টার-মশায় কদিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায়?

মাস্টার-মশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চারদিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাবলুম, যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এত বড়ো অদ্ভুত কেউ হতে পারে, এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর আমি যদি থাকি তা হলে পঞ্চুকেও রাখব। ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে, এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ করে শুনলে; হাঁও বলে না, নাও বলে না; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আমরা বৃন্দাবনে যাব,

আমাদের পথ-খরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথ-খরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা, সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে, তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যা একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল, অন্তত আমি লোকটা সরল। কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে, আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একবার ধর্মটা খোওয়ানো। মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম তা হলে বটে বোঝা যেত। যা হোক, বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে—নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। সে নাকি ওর পারিষদদের কাছে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেছে; দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই-যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার-রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

বিমলার আত্মকথা

এক জন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাত জন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানতুম, এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চার দিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মতো অত বড়ো একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল—আমি তো ডাক দিই নি, সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখলুম, সেই অমূল্যকে—আহা, সে ছেলেমানুষ—কচি মুরলি-বাঁশটির মতো সরল এবং সরস—সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কিরকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতরো কাজ করে এমনি করে তো তা দেখতে পেয়েছি।

তাই সেদিন নিজের 'পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু হল কী? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল, আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন—স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম, বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে।

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরানীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ছোটোরানী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বললেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়! ছুটি কি একটা জিনিস! ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি; হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি' তখন দেখি, এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আসবাব, শুধু আলনা, শুধু আয়না, শুধু খাট; এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝরনা একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই, আসবাব।

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এত বড়ো একটা ধাঁধা লাগল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল। কোথায় মিথ্যে। এ যে ভরপুর সত্য, দুই-কূল-ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই-যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে— ঐ-যে বড়োরানী মালা জপছেন, মেজোরানী থাকো দাসীকে নিয়ে হাসছেন, পাঁচালির গান গাচ্ছেন—আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজার গুণে সত্য।

সন্দীপ বললেন, পঞ্চাশ হাজার চাই। আমার মাতাল মন বলে উঠল, পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়। এনে দেব। কোথায় পাব, কী করে পাব, সেও কী একটা কথা! এই তো আমি নিজের এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি; এমনি করেই এক ইশারায় সব ঘটনা ঘটবে। পারব, পারব, পারব। একটুও সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর চার দিকে চেয়ে দেখি, টাকা কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা—এই-সব সন্ধান করছি। অর্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফতরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েছি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কী করে? মনে দয়া ছিল না; যারা পাহারা দিচ্ছে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তা হলে এখনই আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রানীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল; কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাকলুম। বললুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার— খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বললে, কেন পারব না?

হায় রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম 'কেন পারব না'। অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কী করবে বলো দেখি।

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বললুম, না অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায়?

সে অম্লানমুখে বললে, বাজার লুঠ করে।

আমি বললুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে, তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বললে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চলবে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কিরকম?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্তায় পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে—আর কিছু বললে না।

কী সর্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্তও দেরি হল না। ওর মুখখানি এমনতরো যে মনে হয়, একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে : ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বললুম, বলো কী অমূল্য! আমাদের রায়-মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে—তার যে—

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, এমন মানুষ এ দেশে পাব কোথায়? দেখুন আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া। পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেইজন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারি নে, এই তো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত।

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে। নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না; ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধরে। কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়ো মানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম, তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই, তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপ-মায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।

বিশ্বাসে-উৎসাহে-ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে, একে কে বাঁচাবে?—আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে

ধরছে না? কেন একে বলছে না, ওরে বাছা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি, তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম?

জানি, জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ শয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই শয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা তো কার্যসিদ্ধি চায় না, সে সিদ্ধি যত বড়ো সিদ্ধিই হোক; মা যে বাঁচাতে চায়। আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যত বড়ো উলটো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্বলতা বলে হাসবে। মেয়েমানুষের দুর্বলতাকে ওরা তখনই মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বললুম, যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না; টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম; বললুম, অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে রইল। তারপরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়ালো তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি—তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি—আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বললুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কী করবে দিদি?

মরণ প্র্যাক্‌টিস করব।

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে। এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিল।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারী-হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু, শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগলামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলে। কিন্তু এ কী এ!

এই কি আমার স্বভাব! কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে, এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে। কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। অপদেবতা

কেমন করে আমার উপর ভর করেছে। আজ আমি যা-কিছু করছি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই! বন্দে মাতরং!

আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব! বন্দে মাতরং!

পাঁচ হাজার চাই? আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই? আচ্ছা, কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে—তার পরে মাতালের উৎসব—অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আগুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না—তার পরে টলতে টলতে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে। সমস্ত আগুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে, কিছুই আর বাকি থাকবে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম।

ফি বছর আমার স্বামী পুজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিন হাজার টাকা করে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে বাড়ছে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েছে কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাংকে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড় ছাড়বার ছোটো কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েছে।

ফি বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান, এবার তাঁর আর যাওয়া হল না। এইজন্যেই তো দৈবকে মানি। ঐ টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে, এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার! আর, এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই। প্রলয়ংকরী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েছেন; বলছেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে! আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়। মা গো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে।

এর আগে কতদিন বড়োরানী-মেজোরানীকে আমি মনে মনে চোর বলেছি—আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ। তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারি জিনিসপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার আমার স্বামীকে বলেছি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার রাগ হত; আমি বলতুম, দান করতে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন? বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন। আজ আমি আমার স্বামীর সিন্দুক থেকে ঐ বড়োরানীর মেজোরানীর টাকা চুরি করতে চলেছি।

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর কাপড় ছাড়েন, সেই কাপড়ের পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্দুক খুললুম। অল্প যে একটু শব্দ হল, মনে হল, সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখলুম, নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সব-কটা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয়। চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হয়তো নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা!

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকার—চুরি করে সব খোওয়ালুম।

মনে মনে জপতে লাগলুম, বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং! দেশ, আমার দেশ! আমার সোনার দেশ! সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর-কারো নয়।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলুম—অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে-বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম—সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি—এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম, এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পুজো; দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পূজা নয়; এ জিনিস কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব? চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো! নিজে মরতে বসেছি, কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি!

এ টাকা লোহার সিন্দুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তা হলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক্, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না; সমস্ত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম : দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি; বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চললুম। তখন মেজোরানী ঘটিতে করে তাঁর বারান্দার টবের গাছ-কটিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ওলো ছোটোরানী, শুনেছিস খবর?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এখনই আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে; নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী-চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজোরানী বললেন, তোমাদের দেবীচৌধুরানীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছে।

আমি চোরের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী, প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দে মাতরমের শিন্নি মানছি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই তো হল; এখন দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেলেছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন যত ছট্‌ফট্ করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষনি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি। এ বোঝা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম, সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না—শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি, সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল, আমার মানসম্ভ্রম যা-কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে। আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করছে! এই উপরে অল্প একটুখানিও আব্রু রাখতে দেয় নি।

পুরুষ-মানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোওয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না; প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কী? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি? ছিল বৈকি।

সেই খবরই তো সন্দীপের কাছে শুনেছিলুম, আর সেই শুনেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে, সেই আনন্দে দুই কূল-ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুলত তা হলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায়, এ-সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে গান শুনে স্বর্গ হতে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বললে, টাকা চাই রানী!

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল—সেই বালক—সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তো তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল—সেই মা, সে যেন একই মা! আহা, ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত, ও আমাকে বললে কিনা 'আমার হাতে বিষ তুলে দাও'—আর, আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই রানী!—রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল, সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থর্ থর্ করে আমার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। তার পরে টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে, ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কী ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কী নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল, ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেছি, ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবি দু-তিন শো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা!

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই রানীদিদি?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল, আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল; মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।

চলে যাব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী দু'ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল, এই কম কী! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানীদিদি!

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেললে, গিনিগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ-চোখ আনন্দে ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উলটো হাওয়ার দমকা সামলাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার

মতলব ছিল জানি নে। আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম—হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল; কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টায় পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না; আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল; সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না, আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যর করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে চোখ খুলে দেখি, যেন একেবারে কিছুই হয় নি এমনিভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য আমার পায়ের কাছে থেকে উঠে দাঁড়ালো; ছল্ ছল্ করছে তার চোখ।

সন্দীপ অসংকোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই, সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বললে, আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বললে, তা হোক, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী; আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুশি তাই করো।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বললে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, মেয়েরা যে দেবী!

সন্দীপ বললে, আমরা পুরুষরা বড়ো-জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বললে, রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা হলে আমি ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে, সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্যে ও যে-মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না; সে বললে, রানী, তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে। তার পরেই হঠাৎ আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমাকে প্রণাম করে বললে, দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি।

বলে মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল? তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো মনে হল অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক করতে পারি নে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল। সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল।

আমারই মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধামুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল! আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললে, বন্দে মাতরং।

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময়ে শুনতে পাই নে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে; কেবলই মনে হয়, সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই; দিনরাত্রি স্তব চাই; ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকতেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বসতে পারি নে। অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে সেও আমি পারি নে। আমি তাঁর একটু পিছনের

দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেমনি করে বসে আছি, তিনি খাচ্ছেন, এমন সময় মেজোরানী এসে বসলেন। বললেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ-সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও নি?

আমার স্বামী বললেন, না, সময় পাই নি।

মেজোরানী বললেন, দেখো ভাই, তুমি বড়ো অসাবধান, ও টাকাটা—

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে।

যদি সেখান থেকে নেয়, বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তা হলে কোন্ দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে।

ওগো, আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিস তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর-খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে, সেইসঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই, ভুলে বোসো না। তোমার যেরকম ভোলা মন, কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্ছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তার মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই, তোমাদের বড়োরানীর মতো দিন-রাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে; দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কী লো ছোটোরানী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরানী মনে ভাবে, আমি তোমাকে খোশামোদ করি। তাও, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে হত। কিন্তু তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোশামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বড়োরানীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেত, আধ-পয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তা হলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজোরানী অনর্গল বকে যেতে লাগলেন, তারই মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা ঘণ্টটা চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা ঘুরছে। আর তো সময় নেই, এখনই একটা উপায় করতে হবে। কী হতে পারে, কী করা যেতে পারে, এই কথা যখন বার বার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজোরানীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি, মেজোরানীর চোখে কিছুই এড়ায় না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কী দেখছিলেন জানি নে; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই! আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম; বলে উঠলুম, আসল কথা আমার 'পরেই মেজোরানীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।

মেজোরানী মুচকে হেসে বললেন, তা ঠিক বলেছিস লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষ-মানুষ নই! আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে?

আমি বললুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজোরানী হেসে বললেন, শোনো একবার, ছোটোরানীর কথা শোনো। এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বললেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামি গয়না ছিল খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজোরানীর কাছে খুলে দিলুম। বললুম, মেজোরানী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মেজোরানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই যে অবাক করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস, তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না?

আমি বললুম, ভয় করতেই বা দোষ কী? সংসারে কে কাকে চেনে বলো, মেজোরানী!

মেজোরানী বললেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর-কি! চার দিকে দাসী চাকর ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই!

মেজোরানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরি করবার সময় ছিল না; আমি সন্দীপকে বললুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ নাকি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তা হলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সন্দীপ বললে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু। নইলে আমার হার হবে। আমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারি নে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়ছি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমূল্যকে বললুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সামনে রেখে বললুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি না, গয়না বিক্রি-বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ও-সব কথা রাখো। আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স। আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্নমুখে রেখে দিলে। আমি বললুম, এই-সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রি হবে না, সেইজন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্ছি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ সবই যদি যায় সেও ভালো—কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বললে, দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু, এর জন্য আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলতে পারি নে, এ কী লজ্জা! সন্দীপবাবু বলেন, দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জন করতে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা। দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে, এই শক্তি পেয়েছি। কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত, ওঁর এক-তিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন, টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই, নইলে বন্দে মাতরং মন্ত্র কিসের!

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারো আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-এক দিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু, আহা, এরা যে কাঁচা। সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়। এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি, এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে—আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি, কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকা দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্বে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপবাবুকে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সংকুচিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন, সংসারে যারা ঈশ্বর, ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বললুম, হাঁ।

তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়। আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখদুটো জ্বলে উঠল। বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই?

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ় স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালি করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, রানীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েছেন।

আমি তেজের সঙ্গে বললুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বললে, না, বলব না।

তা হলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম, এখনই সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল, সন্দীপবাবু, কী বলতে চাচ্ছিলেন?

আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বললুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, অমূল্যর হাতে একটা কী বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারে নি। আমি একটু শক্ত করেই বললুম, আপনাকে যদি বলবার হত তা হলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না?

না, বলবে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না; একেবারে আগুন হয়ে উঠে বললে, তুমি মনে করছ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তা হলে সেই ওর সুখের মরণ হয়। ওকে তুমি তোমার পদানত করবে? আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্বল, দুর্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে, ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোর জবরদস্তি খাটবে না; আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যেই আজ এই আস্ফালন। আমি একটি কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।

সন্দীপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশের থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়!

যেখানে ও তোমার প্রতিধ্বনি নয়, সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে তোমার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ, সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমর যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফস্‌কে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা-বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবল যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানা কড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না। মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেইজন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই। কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখদুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল। বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনই সে উঠে এসে আমাকে

চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুলতে লাগল—সমস্ত শরীরের শির দব্ দব্ করছে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুঝলুম, আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারব না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল, কোথায় পালাও রানী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল। আমি বইয়ের শেল্‌ফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকবামাত্রই সন্দীপ বলে উঠল, ওহে নিখিল, তোমার শেল্‌ফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম। মনে আছে তো? ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জমা নিয়ে আমাদের চারজনের মধ্যে লড়াই? বল কী? মনে নেই? সেই যে—

She should never have looked at me,
If she meant I should not love her!
There are plenty... men you call such.
I suppose... she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them :
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম, কিন্তু সেটা এমন হল না 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। এক সময়ে ঠাউরেছিলুম কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই। বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইন্‌স্পেক্টর না হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত; সে খাসা তর্জমাটি করেছিল; পড়ে মনে হয়, ঠিক যেন বাংলাভাষা পড়ছি; যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
(যদিচ ভাই, আমি তাদের গনি নেকো মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে।
যখন মোরে বাঁধল ধরে বিদ্ধ করে নয়নকোণে।

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ—নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা-পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, বোধ হয় ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন 'কাব্যজ্বরো মনুষ্যাণাং' আমাকে ধরবে ধরবে করছে।

আমার স্বামী বললেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি, সন্দীপ।

সন্দীপ বললে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বললেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তোলবার উদ্‌যোগ চলেছে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি?

আমি খবর দিতে এসেছি, পরামর্শ দিতে চাই নে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তা হলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্‌বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্‌বেগের চাপ দাও তা হলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্ছে। আর-একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দল-বল নিয়ে আমার প্রজাদের 'পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

মুসলমানের ভয়ে, না, আরো কোনো ভয় আছে?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা; আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন-পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচ দিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষীরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই—চুরি তোমারই—তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেছ—নাহয় নাম তোমার হল, কিন্তু গান আমার।

এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়,
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলই ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান।
এখন আমার দূরে-যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান?
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে।

সাহসের অন্ত নেই—সে সাহসের কোনো আবরণও নেই, একেবারে আগুনের মতো নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি, অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। বললে, রানীদিদি, তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম, অমূল্য, নিজের জন্যে ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, তোমার মা আছেন?

আছেন।

বোন?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও, অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি, আমার বোনকেও দেখছি।

আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বললে, সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো, আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালোবাস অমূল্য?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরি পিঠে খাব দিদিরানী।

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই-সব জিনিসপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল, আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে খাদ এখনো কাটা হয় নি, তখন বিষম ধাঁধা লেগে যায়; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুঝি আর-একজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি, সন্দীপের দল-বল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তা হলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। এর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস ছিল; সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অদ্ভুত। সেইজন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কী করে!

সে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই মুক্তির স্বাদ এখনই পাচ্ছি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখি গান গেয়ে উঠছে। যে-বিমলা মায়ায় তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠছে।

মাস্টার-মশায়ের কাছে খবর পেলুম, সন্দীপ হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দিনী-পুজোর আয়োজন করছে। এই পুজোর খরচা হরিশ কুণ্ডু তার প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ-মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্ছে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে এই

নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন পৌত্রেরা যদি সেই দেবতাকে আপনার মতো না করে তোলে তা হলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর। সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেল্‌কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য-আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তা হলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে, প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি'—তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর-এক সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক্‌।

যাই হোক, দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়িখানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো করে দেখে, যে মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয়তো বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মতলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু এই ভুল বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক।

ঢাকা থেকে মৌলবি-প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না! উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই; শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়; আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষেও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই, তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি-পড়া বললে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো?

আমি বললুম, এই-যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি। ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বললে, আচ্ছা ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে—আমাদেরই এবার জিত—যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি; এতদিন ওরা রাজা ছিল, আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। এ কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনছি চক্রবর্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশান-ঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে; তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই-ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না। কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরিবের টাকা মারা যাবে, এইজন্যেই আমি শেয়ার কিনব না।

কেন মশাই, দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু দেশের হিত করব বলেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যাবসা চলে নি। আর, খেপে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যাবসা হু হু করে চলবে?

এক কথায় বলুন-না, আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিনব যখন তোমাদের ব্যাবসাকে ব্যাবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে, সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে, আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা ওদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম, তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না। ক-বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম। সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি। অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষীদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়েছে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি, সেই পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। বন্দে মাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই-যে আমার কলের জাহাজ—দূর হোক, সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন এরা জ্বাললে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

এ কী খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে। কাল রাত্রে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল; আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল। অর্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাকাতেরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেছে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, ডাকাতের পালা শেষ হল, এইবার পুলিসের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই, এখন শান্তিও থাকবে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ কী সর্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্যে বললুম, সর্বনাশের এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো কিছু কাল খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন? ঠাকুরপো, তুমি না হয় ওদের একটু মন রেখেই চলো-না। দেশসুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।—

এই সেদিন শুনলুম, নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেছে! ছি ছি! আমি তো ভয়ে মরি! ছোটোরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয়ডর নেই। আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও। এখানে থাকলে ওরা কোন্ দিন কী করে বসে।

মেজোরানীদিদির ভয় ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করলে। অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ-যে টাকাটা রেখেছ, ওটা ভালো করছ না। কোন্ দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে—আমি টাকার জন্যে ভাবি নে, ভাই—কী জানি—

আমি মেজোরানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, ও টাকাটা বের করে এখনই আমাদের খাজাঞ্চিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকেই বিমলা বললে, আমি কাপড় ছাড়ছি।

মেজোরানী বললেন, এই সকালবেলাতেই ছোটোরানীর সাজ হচ্ছে। অবাক করলে। আজ বুঝি ওদের বন্দে মাতরমের বৈঠক বসবে। ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে, এই বলে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দারকে।

সে কী কথা! ঐ তো জখম হয়েছে।

জখম কিছু নয়। পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েছে; সে ওর নিজেরই কীর্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারি নে। ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে সেও একদিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেরে রাখলে কেন?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়; এ দিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন?

তিনি বললেন, না, সে থানায় আছে। এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আসবেন।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করি নি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করি নে। ভয় নেই তোমার, বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না। কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল—চারশো, পাঁচশো লোক, এত বড়ো বড়ো বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম, এ-সমস্ত বাজে কথা; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেছে, নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে। ওর ধারণা, হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ; এমন-কি, তাদের একরাম সর্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেরেছে বলে তার বিশ্বাস।

আমি বললুম, দেখ্ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস নে। হরিশ কুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাস্টার-মশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি; এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না।

আপনি কি মনে করেন এ কাজ—

আমি জানি নে, কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেছে। দাও দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েছি। পরশু এরা সব যাবে।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও—মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু, আর দেরি কোরো না। দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে। এই জন্যে পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি জানি, য়ুরোপ এ কথা মনের সঙ্গে মানে না; কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মানব না। সত্যের জন্যে মানুষ মরে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে তা হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে। কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

সমস্ত দিন এই-সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেছি।

রাত্রে কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। বুঝি কেউ কাঁদছে।

থেকে থেকে বাদলা রাতের দমকা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না।

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি, বিমল মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ-সব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করছেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ—তারই মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই-সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালো মন্দ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই-যে ব্যথার উৎস উঠছে এর কি কোনো নাম আছে? সেই নিশীথরাত্রে, সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি একে বিচার করবার কে? হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড়হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম, ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল। তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্র ধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে-তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিলে; বুকের উপর এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল, সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহারাকে বলে রেখেছি, সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু স্থির থাকতে পারছি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা একবারও আমার বুদ্ধিতে এলই না যে, সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ, আমরা এত অসহায় যে আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম! ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেইদিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে। আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।

আমার আজ মনে হচ্ছে, মানুষকে এক-এক সময় যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে। হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে পড়ে, আর এক রাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক। সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজল। আমার কেমন বোধ হচ্ছে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গহনার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে; কার বাক্স ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব তো শেষকালে আমাকেই দিতে হবে—সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাবটা দেব? মেজোরানী, এতকাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই করেছি। আজ তোমার দিন এল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুলবে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও—আমার সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরানীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব।

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাড়ি-ভিতরে মেজোরানীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্‌দুরে বসে পান সাজছেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনটা সংকুচিত হল, তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরানীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম।

তিনি বলে উঠলেন, ও কী লো ছোটোরানী, তোর হল কী! হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেছি। করো দিদি, আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বলতে লাগলেন, বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, এ কথা আগে বলিস নি কেন? আমার এখানে দুপুরবেলা তোর নেমন্তন্ন রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস নে।

ভগবান, এমন কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হতে পারি নে কি? সব ধুয়ে মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু!

বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে যখন ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম, আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ হেসে বললে, অমূল্য তো নেই, এবার বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে অধিকার আমিই দিয়েছি সে অধিকার আজ ঠেকাই কী করে? বললুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রানী, আর-একজন লোক ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক—আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময় আসবেন, আজ সকালে আমি—

অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা করছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্‌যোগ করছি, এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক্ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চমকে উঠলুম। বললুম, তা হলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বললে, না।

বাঁচলুম। আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌঁছোক—অমূল্য রক্ষা পাক্।

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বললে, এত খুশি রানী? গয়নার বাক্সের এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে তো ফেলেছ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহংকার মরতে মরতেও ছাড়ে না। ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই, এ গয়নার 'পরে আমার সিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বললুম, এ গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান-না।

সন্দীপ বললে, আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর 'পরেই আমার লোভ। লোভের মতো এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত। তা হলে এ-সমস্ত গয়না আমার?

এই বলে সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে, মুখ শুকনো, উস্কখুস্ক চুল। একদিনেই তার তরুণ-বয়সের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েছে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না থাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বললে, আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন?

গয়নার বাক্সটা তোমারই নাকি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা করে হেসে উঠল। বললে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য! তুমিও মরবার আগে ধর্ম-প্রচারক হয়ে মরবে দেখছি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললুম, অমূল্য, কী হয়েছে?

তখনই সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল। সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বললুম, কী হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে! ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে, যাবে কোথায়?

সন্দীপ বললে, এ গয়না আমার। এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মতো বলে উঠল, না না না—কখনোই না। দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না।

আমি বললুম, ভাই, তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক-না।

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে বললে, দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, তোমারও এতদিন জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করি নে। মক্ষীরানী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিস তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করছি, এই রইল। এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, আমি চললুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মধ্যে নেই। যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি?

আমার ভয় হচ্ছিল, এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়, পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে। এখনই তুমি বাড়ি যাও। যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটুলি বের করে বললে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, সে হল না, তাই নোট এনেছি।

অমূল্য, মাথা খাও, সত্যি করে বলো এ টাকা কোথায় পেলে?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বললুম, কী কাণ্ড করেছ অমূল্য? এ টাকা কি—

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি, তুমি বলবে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেছি। আচ্ছা, তাই স্বীকার। কিন্তু, যত বড়ো অন্যায় তত বড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েছি। এখন এ টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুনতে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল। আমি বললুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

সে যে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই! কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে! সন্দীপও তোমার যত বড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি আমি তাই করলুম!

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বললে, সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি। জান দিদি? তোমার কাছে থেকে সেদিন ও যে ছ হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করে নি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি। এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে। একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না, এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে। ওরে অমূল্য, তোরা একে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিস নে। এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য। না না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয় নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেছে; পুলিস সেই নৌকোচুরির কোনো খবর পায় নি। ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। দেখো অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে।—আমি

জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে?—সন্দীপ বললে, জোর করে, ভয় দেখিয়ে।—আমি বললুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।—সন্দীপ বললে, আচ্ছা, সে হবে—কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেছি সে অনেক কথা। সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেছি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।—সন্দীপ বললে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বসল! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বলো বন্দে মাতরং। ঘোর কেটে যাক।—তুমি তো জান দিদি, সন্দীপ কী মন্ত্র জানে। গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপর বসে বন্দে মাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলছে। সে রাগ প্রকাশ করলে না। বললে, দেখো, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে তো নিয়ে যাও।—বলে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেছেন বলুন। সন্দীপ বললে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে তার পরে আমি বলব। এখন নয়।—আমি দেখলুম, কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এরপরেও ওকে এই ছ হাজার টাকারও নোট দেখিয়ে সেই গিনি-কটা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। 'গিনি এনে দিচ্ছি' বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেছে। এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিলে না। এবার বলে কিনা, এ গয়না ওরই দান! আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব? এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।

আমি বললুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি সে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেরি কোরো না অমূল্য, এখনি যাও, এ টাকা যেখান থেকে এনেছ সেইখানেই রেখে এসো। পারবে না, লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়, এর মধ্যে যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ। নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি যে, আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে।

ও কথা বোলো না দিদি! যে রাস্তায় চলেছিলুম সে তোমার রাস্তা নয়। সে রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেছ—এ রাস্তা আমার আরো হাজার গুণে দুর্গম হোক, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব। কোনো ভয় নেই।—তা হলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে, এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানি নে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি, তোমার কাছে আমার নেমন্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। বললুম, আচ্ছা।

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন? এত লোককে নিমন্ত্রণ? আমার একলায় কুলোল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে? আহা, ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য! আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে বাজল, সে শুনতে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা! বেহারা!

কী, রানীমা?

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে।

কী জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না; তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনই জানতুম ফিরে ডাকবে। যে চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসে ছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেছি অমনি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—এখনই যাচ্ছি। ভোজপুরীটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে, লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী বাণ। আবার নিঃশব্দভেদী বাণও আছে। এতদিন পরে এ লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার তো এসে পড়ল। এখন একে নিয়ে কী করবে বলো? একেবারে নিঃশেষে মারবে, না তোমার খাঁচায় পুরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি রানী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেমনি। অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরো না।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেছে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেছি, বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল, ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে বলতে দেবার সময় দিলে না যে ওকে ডাকি নি, অমূল্যকে ডেকেছি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে। এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্ গল্ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাকতে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বললুম, শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সেরকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব-ছলাকলার অন্ত নেই; তার উপরেও দর্জির দোকান, স্যাক্‌রার দোকান তোমাদের সহায়; আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেছেন যে—

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না। দেখছি, এক-একবার আপনি উলটোপালটা বলে বসেন। খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না। একেবারে গর্জে উঠল, তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো। তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী। মন্ত্র যে মুহূর্তে খাটে না সে মুহূর্তেই ওর আর জোর নেই। রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়। দুর্বল! দুর্বল! ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি, বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে। অপমান করো, আমাকে অপমান করো, এইটেই তোমার সত্য। আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্তেই আপনাকে যেরকম সামলে নেয় আজ তার সে শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। আগে হলে আমি এতে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন-না, আমি আজ খুশি হলুম। আমি ঐ দুর্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বসলেন। বললেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম। শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বললে, হাঁ, মক্ষীরানী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আসতে হল।

স্বামী বললেন, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে, কেন, বলো দেখি? আমি কি তোমার অনুচর নাকি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চলো, আমি তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেইজন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো নড়ছি নে।

তা হলে তোমাকে নড়াতে হবে।

জোর?

হ্যাঁ জোর।

আচ্ছা বেশ, নড়ব। কিন্তু, জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার এলেকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরো জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি, সেইজন্যেই এখান থেকে নড়ি নে। মক্ষীরানী, আমার কথা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চললুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরম্ নয়—বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং! মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন। বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণনৃত্যের নূপুরঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছ। দয়ামায়া তোমার নেই গো। এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে। সেই বিষ পান করে, সেই বিষে জর্জর হয়ে, হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। মাতার দিন আজ নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া! দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েছ। পৃথিবীর আর সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া। নিয়মসংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন। প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া! তুমি যে দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করতে পারি। এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো। এরা সবার ভালো করতে চায়। যেন সবই সত্য! কখনোই না। এমন সত্য বিশ্বে আর-কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে। তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার 'পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে। আমি ভালো নই। আমি ধার্মিক নই। আমি পৃথিবীতে কিছুই মানি নে। আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র তাকেই মানি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য। এই কিছু আগেই আমি একে সমস্ত মন নিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম, এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে, কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়, তা নয়—যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময় রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে; স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা, কিন্তু, তবুও—আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটাকে জানি নে, এইটেই স্বীকার করা ভালো—আপনাকেও জানি নে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য। তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন—মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন করবেন।

কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে, আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে, সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর-এক বুদ্ধি বলছে, এই তো মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়— সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি—ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো, সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা, সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন—তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে; ধুলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র। সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ। মাতলামি স্বর্গের সাজ প'রে এসে তাপসদের সামনে নৃত্য করতে থাকে। বলে, তোমরা মূঢ়— তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর; তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েছেন; আমি তোমাদের বরণ করব; আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বললে, এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী! ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তা হলে একে একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে। মুহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম। ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল; তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে, আর, তোমার এই পূজারীকেও। আজ আমার বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম। আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল, আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম। তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব। এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বললুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

অমূল্যর জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে বসেছিলুম, এমন সময় মেজোরানী এসে বললেন, কী লো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকেই খাওয়াবার উজ্জুগ হচ্ছে বুঝি?

আমি বললুম, নিজেকে ছাড়া আর-কাউকে খাওয়াবার নেই নাকি?

মেজোরানী বললেন, আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয়, আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও তো করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে—আমাদের কোন্ কাছারিতে নাকি পাঁচ-ছ শো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে। লোকে বলছে, এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হালকা হল। এ তবে আমাদেরই টাকা! এখনই অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সামনে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক, তার পরে আমার যা বলবার সে আমি তাঁকে বলব।

মেজোরানী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, অবাক করলে! তোর মনে একটুও ভয়-ডর নেই?

আমি বললুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

বিশ্বাস করতে পার না? কাছারি লুট করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি বললেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনই বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোশ সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলা মন যে দেখি তাঁর যে কাপড়ের পকেটে চাবি থাকে সে কাপড়টা তখনো আলনায় ঝুলছে। চাবির রিঙ থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বললুম, কাপড় ছাড়ছি।

শুনতে পেলুম মেজোরানী বললেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করছে, আবার এখনই সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখব! আজ বুঝি ওদের বন্দে মাতরমের বৈঠক বসবে। ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

কী মনে করে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকটা খুললুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম, যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়, যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুলতেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনিই সাজানো রয়েছে। হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই, তবু নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজোরানীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'বলি, এত সাজ কিসের' আমি বললুম, জন্মতিথির।

মেজোরানী হেসে বললেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ। ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখি নি।

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করছি এমন সময় সে এসে পেন্‌সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেছে : দিদি, খেতে ডেকেছিলে

কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি, তারপরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয়তো ফিরে আসতে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চলল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু, মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই-যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি, এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে—সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-নড়তে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারো নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এত বড়ো একটা কথা কেমন করে এবং কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেছেন, তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বলব, সে অধিকারটুকু খুইয়েছি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সংকোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করো'সে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে।—একটু কেশে কথাটা যেই তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে, দারোগাবাবু কাসেম সর্দারকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী উদ্‌বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলি নে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম—এরই মধ্যে কখন—

কেন, কী চাই?

শুনছি, তোরা কাল কলকাতায় যাচ্ছিস। তা হলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়োরানী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায় কথায় চম্‌কে চম্‌কে মরব সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই তো ঠিক?

আমি বললুম, হাঁ, ঠিক।

মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই কি এখানেই থাকি, সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কী, কে জানে! সব ধোঁওয়া, স্বপ্ন!

এই-যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল বলে, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে—এই সময়টাকে কেউ একদিন থেকে আর-এক দিন পর্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তা হলে এরই মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই; অন্তত এই আঘাতটার জন্যে নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করছি, কিছুই ভাবব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক গে। পরশুদিনের মধ্যেই তা যা হবার তো হয়ে যাবে—জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন, প্রশ্নের জবাব, সবই।

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের-দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি—সে আমার বালক-দেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে। সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম। নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম। জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো, এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চার দিকে নানা গুজব জেগে উঠেছে, পুলিস আনাগোনা করছে, বাড়ির দাসী-চাকররা সবাই উদ্‌বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বললে, ছোটোরানীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দাও।—ঘরের ছোটোরানীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, এ কথা বলি কার কাছে? ক্ষেমার গয়না, থাকোর জমানো টাকা আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সয় করে একটি বেনারসি কাপড় এবং তার আর-আর দামি সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল; বললে, রানীমা, এই বেনারসি কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী—থাক্, সে কথা কল্পনা করে হবে কী! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেসরা মাঘের দিন এসেছে। সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে?

অমূল্য লিখেছে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী-চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পরে পিঠে ভাজছি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে, যেন উপরে আমার মহলের দিকে কী-একটা গোলমাল চলছে। হয়তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুলতে এসে চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই নিয়ে মেজোরানী দাসী-চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েছেন। না, আমি শুনব না, কিছু শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাকব।

দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি, থাকো তাড়াতাড়ি আসছে; সে হাঁপিয়ে বললে, ছোটোরানীমা!—আমি বলে উঠলুম, যা যা, বিরক্ত করিস নে, আমার এখন সময় নেই।—থাকো বললে, মেজোরানীমার বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেছেন, সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরানীমা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।—হাসব কি কাঁদব তাই ভাবি। এর মাঝখানেও গ্রামোফোন! তাতে যতবার দম দিচ্ছে সেই থিয়েটারের নাকি সুর বেরোচ্ছে—ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি করবে না, তবু থাকতে পারলুম না; বেহারাকে ডেকে বললুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও।—বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বললে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠল। 'অমূল্যবাবু নেই' সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে, তার পরে আর সে নেই! সম্ভব-অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি। সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব, কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাকব কেমন করে!

অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না, কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল, এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে বালকবেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কী ভালোবাসার দান! কী পাবনমন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজোরানী এসে বললেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যা হোক! আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে? এই বলে তিনি তাঁর সেই গ্রামোফোনটাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরত শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল, যেন গন্ধর্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল, আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন

তাঁর অনেক ঘোরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েছে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে; তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল, আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করছে, রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড় চোখে চাইছে। কেননা, আমি যে একলা। একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয়, যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই। যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে, যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেইজন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি, কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে; মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে, যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি, অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো একবার আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু! যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর-এক দিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও; সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক। তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নূতন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই—একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বললুম, আমি দিন-রাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু! আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে, দেবতা দেখা দেন না? আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না

পারেন। এসো, এসো, এসো! তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাঁপনের উপরে এসে দাঁড়াও প্রভু, আমি এই মুহূর্তেই মরি।

আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল, মূর্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম—ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হত। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে? থাক্ গে আমার কথা।—তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি। কাল যে অপমান আমার জন্যে আসছে সেই অপমানের ডালি সকলের সামনে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবৎ বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন-চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে! কতদিন লাগবে আর—কত যুগ—কত যুগান্তর—সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর-একটিবার ফিরে যেতে! দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা, বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে, আমি জীবন-পথের পথিক। ঘরের কর্তাকে তাই বারে বারে ঘা লাগবে, তার পরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে—যত দূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল তত দূর পর্যন্তই ভালো, তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইল পড়ে, এবার বেরিয়ে পড়লুম—চলতে চলতে যেটুকু চোখে চোখে মেলে, হাতে হাতে ঠেকে, সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তার পরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ। তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পার প্রিয়ে। সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝর্না ঝরে পড়ছে। লক্ষ্মীর অমৃতভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সামনে চলে যাব।

মেজোরানীদিদি এসে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চলল তার মানে কী বলো তো?

আমি বললুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারি নি।

মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু, এখানে আর ফিরবে না নাকি?

আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

সত্যি নাকি? তা হলে একবার এসো, একবার দেখো'সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।

এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটো-বড়ো নানা রকমের বাক্স আর পুঁটলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো, আমার পান সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি, এই-সব দেখছ এক-এক টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলি নি; তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুনি তোমারই স্বদেশী চিরুনি, আর এই—

কিন্তু, ব্যাপারটা কী মেজোরানী? এ-সব বাক্সয় তুলেছ কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

সেকি কথা!

ভয় নেই ভাই, ভয় নেই। তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটোরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে—সেইজন্যেই তো এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্যে দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে আবদারের বাহক ছিলুম আমি; আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করে আনতুম। তার পরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচ-দানা আমার পথ্য ছিল; মেজোরানী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েছেন। এক-এক দিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েছে। তার পরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে, কত ঝগড়াও হয়েছে; বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে; আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, মনে হয়েছে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে, অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখা-প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম, মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটোখাটো জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েছেন, তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কেন মেজোরানী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এ পর্যন্ত কখনো একদিনের জন্যেও এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, কিন্তু তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না, অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিত পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্সপুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে বুঝলুম এমন আর কোনোদিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি, টাকাকড়ি ঘর-দুয়ারের ভাগ নিয়ে, ছোটো-খাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তাঁর যে বার বার ঝগড়া হয়ে

গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়, তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি—বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে একে ম্লান করে দিয়েছে—এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝেছিল, আমার উপর মেজোরানীর দাবি কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর; সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে তার এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম। বললুম, মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেইদিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

মেজোরানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই, মেয়ে-জন্ম নিয়ে আর নয়। যা সয়েছি তা একটা-জন্মের উপর দিয়ে যাক, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষ-মানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই—আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো! ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধু নিতে হবে, ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো এই-সব বোঝা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের একেবারে হালকা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বললুম, তাই তো দেখছি, বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজোরানী বললেন, আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে, আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা। এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।—কখন বেরোতে হবে, ঠাকুরপো?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়। সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে—আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিয়ো, গাড়িতে রাত্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েছে, দেখলেই মনে হয়, আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চলো, এখনই তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বললে, দারোগাবাবু কাকে সঙ্গে করে এনেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজোরানী রাগ করে উঠে বললেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তাঁর সঙ্গে লেগেই রয়েছে! বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বললুম, একবার দেখে আসি গে, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজোরানী বললেন, না, সে হবে না। ছোটোরানী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেছে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখছি।

বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি ভিতর থেকে বললুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই। সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক্ গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক গে। নাহয় হল আমার কাজের অবহেলা।

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দু-পাঁচজনকে ধরা-পাকড়া করছেই। রোজই একটা-না একটা নিরীহ লোককে ধরে-বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেছে; আজও বোধ হয় তেমনি কোন্-এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে! কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে তো ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম। মেজোরানী বাইরে থেকে বললেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বললুম, পিঠে দুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ো। দারোগা যাকে চোর বলে ধরেছে পিঠে তারই প্রাপ্য; বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি, দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে। এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিনী! কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে! আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্ছ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ, আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এসো—তার পরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য, সে যাকে ধরে এনেছে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এ কী অমূল্য যে!

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বললে, আজ্ঞে হাঁ। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হলে যে ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।—বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বললুম, ব্যাপারখানা কী?

দারোগা হেসে বললে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে এক-তাড়া নোট সে আমার সামনে ধরলে। বললে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরোল?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বললেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে। চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে, এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে

তুলেছে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েছি। উনি বললেন, কোথা থেকে পেয়েছি সে আপনাকে বলব না। আমি বললুম, না বললে আপনি তো ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন, মিথ্যে বলব। আমি বলি, আচ্ছা, তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি বললুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়; কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কী দরকারে গিয়েছিলেন, সমস্ত বলা চাই। উনি বললেন, সে-সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব, সেজন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে?

দারোগা বললেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে; তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দে মাতরমের হুজুক উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব। বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো-উনিশ ছিল, পড়তুম রিপন কলেজে; একদিন স্ট্র্যান্ডে একটা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর-দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম, দৈবাৎ ফস্‌কে গেছে।—মহারাজ, এখন চোর ধরা পড়া শক্ত হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা বললে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা, আর-একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্-আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্ছা গেল। দু-চারজন বরকন্দাজ ছুটে আসতেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তার পরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়ে ছ হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ-ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বললে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে আমি বলব।

তিনি কে?

ছোটোরানীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। তিনি একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, পায়ে জুতোও ছিল না; দেখে আমার মনে হল, বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি—সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে।

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি! টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, বাঁচিয়েছ ভাই!

অমূল্য বললে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার বন্দে মাতরম্ মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বললে, সব খাই নি, কিছু রেখেছি—তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে বলে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম, এখানে আমার আর দরকার নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে—যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার, আমরা নিবোনো, আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বলল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয়, আর-একবার মেজোরানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সংসারে কোনো-একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে, এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার। নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজোরানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এই-যে ঠাকুরপো, আমি বলি, বুঝি তোমার আজও দেরি হয়। আর দেরি নেই, তোমার খাবার তৈরি রয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোনো আশকারা হল নাকি?

সেই ছ হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোরানীর কাছে আমার বলতে ইচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলছে।

লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি, সিন্দুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা! এই চাবির রিঙ নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেছি, আলমারি খুলেছি, কিন্তু একবারও লক্ষই করি নি যে চাবিটা নেই।

মেজোরানী বললেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে বৃথা এ পকেট ও পকেট নাড়া দিলুম, দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিঙ থেকে খুলে নিয়েছে। কে নিতে পারে? এ ঘরে তো—

মেজোরানী বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটোরানী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেছে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেকতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিঙ থেকে চাবি বের করে নেবে, এ তার স্বভাব নয়।

আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিল না, সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজোরানী তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেছি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল, মেজোরানীর সামনে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘটল না। বিমল আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোর লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে জানিস?

বিমল বললে, আমার কাছে।

মেজোরানী বললেন, আমি তো বলেছিলুম। চার দিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছে, ছোটোরানী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলের মুখ দেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল; বললুম, আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক্, বিকেলে টাকাটা বের করে নেব।

মেজোরানী বলে উঠলেন, আবার বিকেলে কেন ঠাকুরপো, এই বেলা ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বললে, টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায়?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোরানী বললেন, ওমা, শোনো একবার! এত টাকা খরচ করলি কিসে?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না; দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজোরানী বিমলকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন; আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম। জানতুম সে টাকা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা। কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান! তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।

মেজোরানী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্লমুখে বললেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই! তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি! পান নেই ঘরে? নাহয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দে-না।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয় নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে, বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজোরানী বললেন, ও কী, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? বেলা যে ঢের হল—এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কী রকমের যোগ সে কথা জানতেও ইচ্ছা করল না। কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন। আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব, এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্তার ইশারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করতে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব, এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েছি। প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে, কারো জীবন একলার জিনিস নয়; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চার দিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টানব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না, এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চার দিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর-সবই নিয়েছে কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব, এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্ছে, আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব, আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাত হয়ে গেছি, তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ খইয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে। আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা, ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হলে একবার সহজে রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না। কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো, এই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার ফরমাশ একেবারে চাপা পড়ুক; তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতরো একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে যে আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে? যে আবরুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আবরু যে একবারে ছিন্ন হয়ে গেল! ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়। এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব; বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব; একদিন এমন হবে যে, এই ক্ষতর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কত দিন লাগবে ভুল শোধরাতে? তার পরে? তার পরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে?

একটা কি খট্ করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল—ঘরে ঢুকবে কি না-ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল!

সে থমকে দাঁড়ালো, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বললে, না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পুজো করতে দিয়ো।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য—সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো, সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর-বাহিরের নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বসলুম। খনিকবাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুটলেন। আমি বললুম, না, ও হবে না, তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েছ।

আমার স্বামী বললেন, আমিই যেন কথা দিয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি, তার যে দেখা নেই।

আমি বললুম, না, সে হবে না, তুমি শুতে যাও।

তিনি বললেন, তুমি একলা পারবে কেন?

খুব পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে, এ জাঁক তুমি করতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই, একলা ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে সন্দীপবাবু এসেছেন, তিনি খবর দিতে বললেন।

খবর কাকে দিতে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে এক মুহূর্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, শুনে আসি সন্দীপ কী বলে। ও তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার যখন ফিরে এসেছে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়াটাই বেশি লজ্জা বলে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে-টাঙানো ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা ভাবছ, লোকটা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটুলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বললে, নিখিল, ভুল কোরো না। ভেবো না, হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে

ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিচ্‌কাঁদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি, সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম, পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না—তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী! এই নাও।

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বললেন, শুনে যাও সন্দীপ!

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল! খবর পেয়েছি, মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব, এখনকার মতো চললুম। তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃৎপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনো দিন এমন করে দেখতে পাই নি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম। এখন মনে হল, কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই, কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি।—নিখিল, মুসলমানের দল খেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে! মাস্টার-মশাই, আপনি ওঁকে বারণ করুন!

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নয়।

আমার স্বামী বললেন, কিছু ভেবো না বিমল!

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরেই মেজোরানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললেন, করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি! ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন!

বেহারাকে বললেন, ডাক্ ডাক্, শিগরির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।

দেওয়ানবাবুর সামনে মেজোরানী কোনোদিন বেরোন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বললেন, আমরা অনেক মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না।

মেজোরানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে, তাঁর মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজোরানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী! সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনে-গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো; তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল, আজকের দিনটা যেন হুহু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি, মেজোরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নহবৎখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কত রকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস্ করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তার পরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়-সোয়ার রাজবাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে ছুটে চলছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল, সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিয়ে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো, অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল, একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর, খবর কী?

সে বললে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

তার পরে কী চুপি চুপি বললে শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কি আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুকল। পাল্কির পাশে মথুর ডাক্তার আসছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, কী মনে করেন?

ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হয়ে গেছে।

গ্রন্থপরিচয়

ঘরে-বাইরে ১৩২২ সালের সবুজ পত্রে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত ও ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কালে সবুজ পত্রে-মুদ্রিত বহু অংশ বর্জিত হইলেও পরবর্তী ১৯২০ খৃস্টাব্দের পরিবর্ধিত সংস্করণে সে-সমস্তই পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। বর্তমান মুদ্রণ উক্ত পরিবর্ধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ এবং সবুজ পত্রের পাঠের সহিত অভিন্ন। উপন্যাসখানি যখন সাময়িক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছিল তখনই ইহার নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে থাকে। ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে একখানি চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণের সবুজ পত্রে যে 'টীকাটিপ্পনি' লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল—

লেখার উদ্দেশ্য

আমি যা লিখে থাকি তা অনেকের ভালো লাগে না। এই কথাটি আমাকে সাধারণত যে ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয় নানা স্বাভাবিক কারণে সে ভাষায় আমার দখল নেই। এইজন্য যথারীতি তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

এমন অবস্থায় হঠাৎ একখানি চিঠি পেলুম, সেই চিঠিতে অভিযোগ আছে কিন্তু অবমাননা নেই। চিঠিখানি কোনো মহিলার লেখা, তিনি আমার অপরিচিত। এই চিঠিতে তাঁর স্ত্রীজনোচিত সংযম ও সৌজন্য এবং মাতৃজনোচিত করুণা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি দুঃখবোধ করেছেন, কিন্তু দুঃখ দিতে চান নি।

তিনি নিজের কোনো ঠিকানা দেন নি, অথচ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন, এর থেকেই অনুমান করছি যে, এই প্রশ্ন তিনি সাধারণের হয়ে পাঠিয়েছেন এবং সাধারণের ঠিকানাতেই এর জবাব চান।

অতএব তাঁর ভর্ৎসনার উত্তরে যে-ক'টি কথা বলবার আছে সে আমি এই সবুজ পত্র-যোগে তাঁর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি। এই উপলক্ষে সাধারণত আমাদের দেশে যে ভাবে সাহিত্যবিচার হয়ে থাকে প্রসঙ্গত সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করব।

প্রথমত তিনি কিছু ক্ষোভের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছেন—ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানি লেখবার উদ্দেশ্য কী?

এর সত্য উত্তরটি এই যে, উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই উপন্যাস লেখা। সাদা কথায়, গল্প লিখব আমার খুশি!

কিন্তু একে উদ্দেশ্য বলা যায় না। কেননা 'খুশি' বলাই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। এবং যখন কোনো-একটা উদ্দেশ্যই লোকে প্রত্যাশা করছে তখন সেটা নেই বললেই কথাটা স্পর্ধার মতো শুনতে হয়।

কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্য বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায়। হরিণের গায়ে চিহ্ন আছে কেন হরিণ তা জানে না, কিন্তু হরিণ সম্বন্ধে যাঁরা বই লেখেন তাঁরা বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই-সমস্ত চিহ্নের দ্বারা বনের আলোছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়ে থাকতে পারবে।

এই আন্দাজ সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে হরিণের মনের নয় সে কথা সকলকেই মানতে হবে।

উদ্দেশ্য হরিণের নয়, কিন্তু হরিণের ভিতর দিয়ে বিশ্বকর্মার একটা উদ্দেশ্য তো প্রকাশ পাচ্ছে। তা হয়তো পাচ্ছে। তেমনি যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।

আমি বলছি, এ কাজও শিল্পকাজ; শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনছে, সেই তার সৃষ্টি; আমি তার থেকে যদি কিছু আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারই।

আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্প-কাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।

পৃথিবীর খুব একজন বড়ো লেখকের লেখা সামনে ধরা যাক। শেক্‌সপীয়রের ওথেলো। কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁর উদ্দেশ্য কী, তিনি মুশকিলে পড়বেন। ভেবে চিন্তে যদি বা কোনো উত্তর দেন, নিশ্চয়ই সেটা ভুল উত্তর হবে।

আমি যদি ব্রাহ্মণসভার সভ্য হই তবে আমি ঠিক করব, কবির উদ্দেশ্য বর্ণভেদ বাঁচিয়ে চলা সম্বন্ধে জগৎকে সদুপদেশ দেওয়া। যদি স্বাধীন জেনেনার বিরুদ্ধ-পক্ষ হই তা হলে বলব, পরপুরুষের মুখদর্শন পরিহার করতে বলাই কবির পরামর্শ।

কিম্বা কবির বুদ্ধি বা ধর্মজ্ঞানের প্রতি যদি আমার সন্দেহ থাকে তা হলে বলব, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নিদারুণ পরিণাম দেখিয়ে তিনি সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। কিম্বা ইয়াগোর চাতুরীকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করে তুলে সরলতার প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ প্রকাশ করাই তাঁর মতলব।

কিন্তু সোজা কথা হচ্ছে, তিনি নাটক লিখেছেন। সেই নাটকে কবির ভালোলাগা, মন্দ-লাগা, এমন-কি, কবির দেশ-কালও প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশ-রূপে নয়, শিল্পরূপেই। অর্থাৎ সমস্ত নাটকের অবিচ্ছিন্ন প্রাণ এবং লাবণ্যরূপে। যেমন একজন বাঙালিকে যখন দেখি তখন মানুষটার সঙ্গে তার জাতিকে, তার বাপ-দাদাকে সম্মিলিত করে দেখি; তার ব্যক্তি এবং তার জাতি দুইয়ের মাঝখানে কোনো জোড়ের চিহ্ন থাকে না; এও তেমনি। কবির কাব্যে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে।

তাই বলছিলুম, ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালো-মন্দ-লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। শৌখিন লোকে চমরীর পুচ্ছ থেকে চামর তৈরি করে; কিন্তু চমরী জানে তার পুচ্ছটা তার প্রাণের অন্তর্গত—ওটাকে কেটে নিয়ে চামর করা অন্তত তার উদ্দেশ্য নয়, যে করে তারই।

গল্পের মত

তার পরে কথা হচ্ছে, আমার হৃদয়ভাবের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ভাবের যখন বিরোধ ঘটল তখন পাঠক আমাদের দণ্ড দিতে বাধ্য।

মাটির উপর পড়ে গেলে শিশু যেমন মাটিকে মারে তেমনি এমন স্থলে সাধারণ পাঠকে দণ্ড দিয়ে থাকে, এ কথা আমার বিশেষরূপ জানা। তাই বলে দণ্ড যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ভূতকে না ভয় করতে পারি, এমন-কি, ভূতের ভয় অনিষ্টকর মনে করতেও পারি, তবু ভূতের ভয়ের গল্প পড়বার সময়ে সে কথা মনে রাখবার দরকার নেই। এখানে মতামতের কথা নয়, রসের অনুভূতির কথা। খৃস্টান রসিক যখন কোনো হিন্দু আর্টিস্টের আঁকা দেবীমূর্তির বিচার করেন তখন যদি তিনি ভুলতে পারেন যে তিনি মিশনারি তা হলেই ভালো, যদি না পারেন তবে সেজন্যে হিন্দু আর্টিস্টকে দোষ দেওয়া চলবে না। কারণ হিন্দু আর্টিস্ট্ স্বভাবতই আপন মত বিশ্বাস সংস্কার-অনুসারে ছবি আঁকবেই। কিন্তু যেহেতু সেটা ছবি সেইজন্যেই তার মধ্যে মত বিশ্বাস সংস্কারের অতীত একটি জিনিস থাকবে, সেটি হচ্ছে রস; সে রস যদি অহিন্দুর অগ্রাহ্য হয় তবে হয় রসবোধের অভাবে সেটা অহিন্দুর দোষ, নয় রসের অভাবে সেটা হিন্দু আর্টিস্টের দোষ। কিন্তু দোষটা মত-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। প্রদীপ ইংরেজের একরকম, এবং ডীট্জ্ লণ্ঠন চলিত হবার পূর্বে হিন্দুর অন্যরকম ছিল, তবু আলো জিনিসটা আলোই।

দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকের মতভেদ থাকা সম্ভব; কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার তো দরকার নেই, গল্প বলেই দেখতে হবে।

গল্পের খাতির

কিন্তু মত যখন এমন বিষয় নিয়ে যেটা দেশের একেবারে মর্মের কথা তখন পাঠকের কাছ থেকেও অতটা বেশি নিরাসক্তর সানুভূতি দাবি করা যায় না। তখন পাঠকের নিজের ব্যথা গল্পের ব্যথাকে ছাড়িয়ে ওঠে। অতএব সে জায়গায় রসের বিচারের চেয়ে রসের বিষয়বিচারটা স্বভাবতই বড়ো না হয়ে থাকতে পারে না।

আচ্ছা বেশ, তাই মানলুম। তা হলে এ স্থলে লেখকের প্রতি উপদেশটা কী? নিজে যেটাকে ভালো মনে করি পাঠকের খাতিরে চেষ্টা করব সেটাকে মন্দ মনে করতে? পাঠক

যদি গল্পের খাতিরে সে কাজ করতে না পারেন তা হলে লেখকই বা পাঠকের খাতিরে এমন কাজ কী করে করবেন?

বস্তুত খাতিরটা গল্পের, লেখকেরও নয়, পাঠকেরও নয়। সেই গল্পের খাতিরেই নিজের হৃদয়ভাব সম্বন্ধে লেখককে নিজের হৃদয় অনুসরণ করতে হবেই এবং সেই গল্পের খাতিরেই পাঠককে গল্পের রস অনুসরণ করতে হবে।

যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়ো, তবে সে কথা পাঠক সম্বন্ধেও যেমন খাটে লেখক সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে, এ কথা লেখকের ভাববার নয়; তিনি ভাববেন, তাঁর গল্পটি ঠিকমত হওয়া চাই; তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়।

আখ্যায়িকা

লেখিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কি আমার কল্পনাপ্রসূত, না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে। যদি পেয়ে থাকি তবে সে কি আধুনিক 'পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বিলাসী-সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দুপরিবারে?'

উত্তর এই, আখ্যায়িকাটি অধিকাংশ গল্পের আখ্যায়িকার মতোই আমার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এইটুকুমাত্র বললেই লেখিকার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয় না। ঐ প্রশ্নের মধ্যে একটি কথা চাপা আছে যে, এমন ঘটনা প্রাচীন হিন্দুপরিবারে অসম্ভব।

ঠিক একটা গল্পের ঘটনা সেই গল্পের অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে, আর কোথাও ঘটতে পারে না—প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা অহিন্দু কোনো পরিবারেই না। অতএব কোনো বিশেষ পরিবারে কী ঘটেছে সে কথা স্মরণ করে গুজব করাই চলে, গল্প লেখা চলে না। মানবচরিত্রে যে-সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেইগুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুই জায়গায় ঠিক একই-রকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে। এইজন্যে সেই মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।

সাহিত্যবিচার

তা হলে প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন হিন্দুপরিবারে সর্বত্রই মানবচরিত্র কি মনু-সংহিতার রাশ মেনে চলে? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না?

আমরা বৈদিক পৌরাণিক কাল থেকে এইটেই দেখে আসছি যে, বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুলের লড়াইয়ের অন্ত নেই। এক দিকে শাসনও কড়া, অন্য দিকে মানবের প্রকৃতিও উদ্দাম; তাই কখনো শাসন জেতে, কখনো প্রকৃতি। এই লড়াই যদি প্রাচীন

হিন্দুপরিবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় তবে সেই প্রাচীন হিন্দুপরিবারের ঠিকানা এখনো পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক, যেখানে মন্দ একেবারেই নেই সেখানে ভালোও নেই। প্রাচীন হিন্দুপরিবারে কারো পক্ষে মন্দ হওয়া যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে সে পরিবারের লোক ভালোও নয়, মন্দও নয়, তারা সংহিতার 'কলের পুতুল'। ভালো-মন্দর দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে মানুষ ভালোকে বেছে নেবে বিবেকের দ্বারা, প্রথার দ্বারা নয়, এই হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় যে-সকল কুৎসিত স্ত্রীনিন্দা দেখতে পাই বর্তমান কোনো পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানীর লেখায় তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। তার কারণ, আধুনিক কবিরা স্ত্রীজাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে থাকেন। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, সেই-সকল প্রাচীন স্ত্রীনিন্দাগুলি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মিথ্যা, কিন্তু যদি স্ত্রীবিশেষ সম্বন্ধেও মিথ্যা হয় তবে সেই কবিতাগুলির উদ্ভব হল কোথা হতে?

তা হলে বোধ হয় তর্কটা এইরকম দাঁড়াবে; মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘন করবার একটা বেগ আছে, কিন্তু সেটা কি সাহিত্যে বর্ণনা করবার বিষয়? এ তর্কের উত্তর আবহমান কালের সমস্ত সাহিত্যই দিচ্ছে, অতএব আমি নিরুত্তর থাকলেও ক্ষতি হবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতিশাস্ত্রবিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের কোন্ নায়িকা 'হিন্দুরমণী' হিসাবে কতটা উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে তাই নিয়ে সমালোচক-মহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলে থাকে। ভ্রমর তার স্বামীর প্রতি অভিমান করেছিল—সেটাতে তার হিন্দু-সতীত্বে কতটা খাদ ধরা পড়েছে, সূর্যমুখী স্বামীর প্রেয়সী সতিনকে নিজেরও প্রেয়সী করতে না পারাতে তার হিন্দুরমণীত্বের কতটা লাঘব হয়েছে, শকুন্তলা কী আশ্চর্য হিন্দুনারী, দুষ্যন্ত কী আশ্চর্য হিন্দুরাজা, এই-সকল বিচার-প্রহসন আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের নাম ধরে নিজের গাম্ভীর্য বাঁচিয়ে চলতে পারে—জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। শেক্স্পীয়র অনেক নায়িকার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ইংরেজ-রমণীত্ব কতটা প্রকট হয়েছে এ নিয়ে কেউ চিন্তা করে না, এমন-কি, তাদের খৃস্টানির মাত্রা নিক্তির ওজনে পরিমাপ করে পয়লা দোসরা মার্কা দেওয়া খৃস্টান পাদ্রিদের দ্বারাও ঘটা সম্ভব নয়।

আমি হয়তো এ কথা বলে ভালো করলুম না। কেননা, জগতে যা কোথাও নেই সেইটেই ভারতে আছে, এই হচ্ছে আধুনিক বাঙালির গর্ব। কিন্তু ভারত তো বাঙালির সৃষ্টি নয়, আমরা সাহিত্য-সমালোচনা শুরু করবার পূর্বেও ভারতবর্ষ ছিল। সেই ভারতের অলংকারশাস্ত্রে নায়িকা-বিচার মনুপরাশরের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয় নি, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য-অনুসারেই তাদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছিল। আমি এরকম শ্রেণীবিভাগ ভালো বলি নে। কারণ, সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়; সাহিত্যে শ্রেণীর ছাঁচে নায়ক-নায়িকার ঢালাই হতে থাকলে সেটা পুতুলের রাজ্য হয়, প্রাণের রাজ্য হয় না। তবু যদি নিতান্তই শ্রেণীবিভাগের শখ সাহিত্যেও মেটাতে হয় তা হলে ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট হিন্দু ও অহিন্দু এই এই শ্রেণী না ধরে যথাসম্ভব মানবস্বভাবের বৈচিত্র্য-অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা কর্তব্য।

লেখিকার কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, গল্পের ভিতর থেকে গল্পের চেয়ে বেশি কিছু যদি আদায় করতেই হয় তা হলে অন্তত গল্পের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর-একটি কথা এই যে, আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তা হলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে, কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি। দুঃখ পাই তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সকলের চেয়ে বেদনার বিষয় এই যে, যা সত্য মনে করি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখিকার মতো অনেক সরল শ্রদ্ধাবান স্বদেশবৎসল ও সকরুণ হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি। সে আমার দুর্ভাগ্য, কিন্তু সে আমার অপরাধ নয়।

—সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২২

ঘরে-বাইরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিয়াছিল। ১৩২৬ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেন; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

সাহিত্যবিচার

ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানা লইয়া বাংলার পাঠক-মহলে এখনো কথা চলিতেছে। হৃদয়াবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন মানুষ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ধরে। সম্প্রতি তাহারও সূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এক জায়গায় দেখিলাম, ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইলাম। পাছে ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে, সেইজন্য এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না। ভর্তৃহরির অনেক পূর্ব হইতেই কবিরা এ সম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। স্বয়ং কালিদাসও কবিতাই লিখিয়াছেন, কিন্তু দিঙ্‌নাগাচার্যের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই। সাধারণত কবিদের নিন্দা-অসহিষ্ণু বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু সেই অসহিষ্ণুতা লইয়া (দুই-একজন ছাড়া) তাঁহারা নিজেরাই ক্ষোভ অনুভব করিয়াছেন, সাহিত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন নাই। যখন তাঁহাদের লেখার প্রতি কেহ কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে তখন সেই কলঙ্কভঞ্জনের ভার তাঁহারা কালের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে ইহাই প্রমাণ হইয়া গেছে যে, তাঁহাদের রচনার কলসে আলংকারিক ছিদ্র, একটা কেন, একশোটা থাকিতে পারে, কিন্তু তবু তাহা হইতে রস বাহির হইয়া যায় নাই; সাহিত্যে এই কলঙ্কভঞ্জনের পালা অনেক দিন হইতে অনেকবার অভিনীত হইয়াছে, যাঁহারা আলংকারিক তাঁহাদের গঞ্জনা হইতে কবিরা বারবার রক্ষা পাইয়াছেন।

ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রসবোধ লইয়া যদি কথা উঠিত তবে সে কথা যতই কটু হউক নীরব থাকিতাম। কিন্তু যে কথা উঠিয়াছে তাহা সাহিত্যসীমানার বাহিরের জিনিস। তাহা যুক্তির অধিকারের মধ্যে, সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক চলে, এবং তর্ক না চালাইলে কর্তব্যপালন করা হয় না; কারণ, যাহা অন্যায় তাহাকে সহ্য করিয়া গেলে সাধারণের প্রতি অন্যায় হয়।

ঘরে-বাইরে বাহির হইবার পরেই আমার বিরুদ্ধে একটা নালিশ শোনা গেল যে, আমি এই উপন্যাসে সীতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছি। কথাটা এতই অদ্ভুত যে আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এমন-কি, আমাদের দেশেও ইহা গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিলাম লোকে উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছে, এবং জনগণের নিন্দায় একদা সীতা যেমন নির্বাসিত হইয়াছিলেন এ গ্রন্থও সেইরূপ গণ্যমান্যদের সভা ও লাইব্রেরি-ঘরের টেবিল হইতে নির্বাসিত হইতে থাকিল।

এটাকে সামান্য ব্যক্তিগত হিসাবে দেখিলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু যে-কোনো প্রভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে সেই প্রভাব যদি ব্যাপক হইয়া উঠিতে থাকে, তবে সেটাকে সাধারণের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব ঘরে-বাইরে গ্রন্থের যে অপরাধ বানাইয়া তুলিয়া আমার প্রতি কেবলই আক্রোশবর্ষণ চলিতেছে সেই অপরাধের অভিযোগটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

মহাকাব্য নাটকে বা নভেলে যে আখ্যানবস্তু পাওয়া যায় তাহার নানা বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সকল বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সেই-সমস্ত আখ্যানে একটি সাধারণ উপাদান দেখিতে পাই; সেটি আর কিছু নয়, সংসারে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব। তাই রামায়ণে দেখিয়াছি রাম-রাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে দেখিয়াছি কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ। কেবলই সমস্তই একটানা ভালো, কোথাও মন্দের কোনো আভাসমাত্র নাই, এমনতরো নিছক চিনির শরবত দিয়াই সাহিত্যের ভোজ সম্পন্ন করা অন্তত কোনো বড়ো যজ্ঞে দেখি নাই।

এত বড়ো মোটা কথাও যে আমাকে আজ বিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে সেজন্য আমি সংকোচ বোধ করিতেছি। শিশুরা যে রূপকথা শোনে সেই রূপকথাতেও রাক্ষস আছে; সেই রাক্ষস শুদ্ধ সংযত হইয়া কেবলই মনুসংহিতা আওড়ায় না, সে বলে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ'। ধর্মনীতির দিক হইতে দেখিলে তাহার পক্ষে এমন কথা বলা নিঃসন্দেহই গুরুতর অপরাধ। আশা করি, যাহারা এই সকল গল্প রচনা করিয়াছিল তাহারা নরমাংসাশী ছিল না এবং যাহারা এই-সব গল্প শোনে নরমাংসে তাহাদের স্পৃহা বাড়ে না। তাই বলিতেছি, মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের লুব্ধতা উদ্রেক হওয়া ধর্মশাস্ত্রমতে অপরাধ সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের গন্ধে গল্পের রাক্ষসের ভ্রাতৃপ্রেম যদি জাগিয়া উঠিত এবং সে যদি সুমধুর স্বরে বলিয়া উঠিত 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' তবে সাহিত্যরসনীতি-অনুসারে রাক্ষসের সে অপরাধ কিছুতে ক্ষমা করা চলিত না। কোনো শিশুর কাছে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এক মুহূর্তেই আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু সেই শিশুই কি বড়ো হইয়া এম. এ. পাস

করিবামাত্র গল্পের রাক্ষসটা মরাল্-ফিলজফির নীচে চাপা পড়িয়া সরু সুরে শান্তিশতক আওড়াইতে থাকিবে?

যাই হউক, সকল ভাষার সকল সাহিত্যেই ভালো মন্দ দুই-রকম চরিত্রেরই মানুষ আসরে স্থান পায়। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও সেইরূপ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্যই ঘরে-বাইরে নভেলে যখন সন্দীপের অবতারণা করিয়াছিলাম তখন মুহূর্তের জন্যও আশঙ্কা করি নাই যে, সেটা লইয়া আমাদের দেশের উপাধিধারী এত গণ্যমান্য লোকের কাছে আমাকে এমন জবাবদিহির দায়ে পড়িতে হইবে। এখন হইতে ভবিষ্যতে এই আশঙ্কা মনে রাখিব, কিন্তু স্বভাব সংশোধন করিতে পারিব না; কেননা আমাদের দেশের বর্তমান কাল ছাড়াও কাল আছে এবং গণ্যমান্য লোক ছাড়াও লোক আছে, তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষসের মুখ হইতে এই অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ কথা শুনিতে চায়—হাঁউ মাঁউ খাঁউ! মানুষের গন্ধ পাঁউ! চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য প্রয়োগেও তাহারা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উদ্‌বিগ্ন হইবে না।

জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যত বড়ো মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ত-স্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব। তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনি তো অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, 'মালক্ষ্মী, আমি বিশ হাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।' বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া, জয়দ্রথকে দিয়া, দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন? রাবণ রাবনের যোগ্যই কাজ করিয়াছে, দুঃশাসন জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই সাজে। তেমনি আমার মতে, সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য; অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সংগত হইয়াছে। এবং সেই সংগতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।

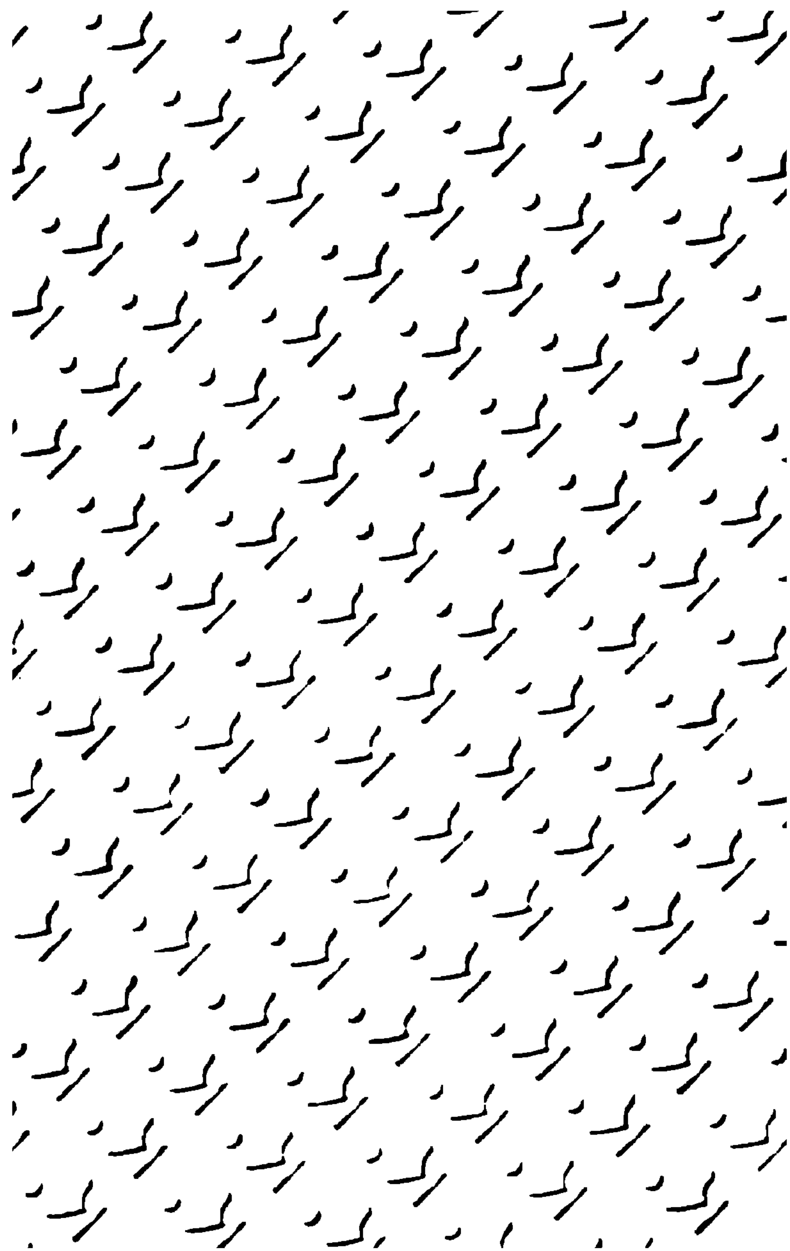
যদি আধুনিক কালের কোনো উপাধিধারী এমন কথা গদ্যে বা পদ্যে বলিতে পারিতেন যে, রাবণের পক্ষে সীতাহরণ কাজটা অসংগত, মন্থরার পক্ষে রামের প্রতি ঈর্ষা অযথা, সূর্পনখার পক্ষে লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক অসম্ভব, তাহা হইলে নিশ্চয় কবিগুরু বিচারসভায় হাজির থাকিলেও নিরুত্তর থাকিতেন; কেননা এমন-সকল আলোচনা সাহিত্যসভায় চলিতে পারে। কিন্তু তাহা না বলিয়া ইঁহারা যদি বলিতেন, এ-সকল বর্ণনা নিন্দনীয়, কারণ ইহাতে সীতাকে রামকে লক্ষ্মণকে অপমানিত করা হইয়াছে এবং এই অপমান স্বয়ং কবিকৃত অপমান, ধর্মশাস্ত্র-অনুসারে এই-সকল ভালোমানুষের প্রতি সকলেরই সাধু ব্যবহার করাই উচিত, তবে যে কবি সর্বাঙ্গে কীটের উৎপাত স্তব্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন তিনিও বোধ হয় বিচলিত হইয়া উঠিতেন।

আমি অন্য দেশের কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিলাম না। কেননা এমন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত যে, অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকা আমাদের ন্যাশনাল সাহিত্যের লক্ষণ—অর্থাৎ ন্যাশনাল সাহিত্য কূপ-মণ্ডূকের সাহিত্য।

—প্রবাসী। চৈত্র ১৩২৬

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে (২৯ ফাল্গুন ১৩২২) ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

প্রমথ চৌধুরী এই গল্পটিকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সে বোধ হয় কতকটা লীলাচ্ছলেই করে থাকবেন। এর মধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই, এ কেবলমাত্রই গল্প। মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে। তার চেয়ে বেশি যদি কিছু থাকে সেটা অবান্তর এবং আকস্মিক।



চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

ঘরে-বাইরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



